মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

# নবীন

ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

**২০১ গম্বুজ মসজিদ**। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার নগদা শিমলা ইউনিয়নের দক্ষিণ পাথালিয়া গ্রামে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গম্বুজ এবং দ্বিতীয় উচ্চতম মিনার বিশিষ্ট মসজিদ। ১৫ বিঘা জমির ওপর মসজিদ ও মসজিদ কমপ্লেক্স অবস্থিত। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে নির্মিত মসজিদটি নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা। ডিতল এই মসজিদে একসঙ্গে প্রায় ১৫ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন। মসজিদের দেয়ালের টাইলসে অংকিত রয়েছে পূর্ণ পবিত্র কোরআন শরিফ। যে কেউ বসে বা দাঁড়িয়ে মসজিদের দেয়ালে অংকিত কোরআন শরিফ পড়তে পারবেন।

**ফুলচৌকি মসজিদ**। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ফুলচৌকি গ্রামে অবস্থিত মুঘল আমলের একটি মসজিদ। সুন্দর এই মসজিদটি আয়তকার এবং প্রতিটি কোণায় গোলাকার কিউপলা যুক্ত স্তম্ভ রয়েছে। যার নিচের অংশে কলসাকৃতি। মসজিদের সামনে খোলা অঙ্গন অনুচ্চ প্রাচীর বা বেষ্টনী দ্বারা আবৃত। মসজিদের প্রবেশ দ্বার পূর্বপাশ ঘেঁষে একটি পরিকল্পিত এলাকা, যেটি এখন কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও সেখানে একসময় স্থাপত্য সৌকর্যমন্ডিত শোভিত ও সৌরভমুখরিত ফুল বাগান ছিল। ফুলচৌকি নামক স্থানে অবস্থিত বলেই সম্ভবত এই গ্রামকে কেন্দ্র করে মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে।

# নবীন

ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

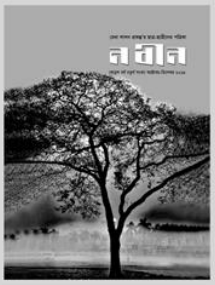

## সূ চি প ত্র

উন্নয়ন ভাবনা, বৈষম্য ও আমাদের সংবিধান ২
শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত পিরামিডের মতো ৪
অংকুর ৬
কেমন হতে পাওে এক হাজার বছর পরের মানুষ ৮
উপদেশ-কূপদেশ ১০
তোমাদের আমার হিংসা হয় ১১
সম্ভাবনার পাশাপাশি বিপদের সঙ্গেও
পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ডিজিটালাইজেশন ১২
ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ ১৪
তামাক বিরোধী আন্দোলনে যুব সমাজের ভূমিকা ১৬
হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার পাখি ১৮
জামদানির জাদু ১৯
কম খরচে পড়া যাবে যুক্তরাষ্ট্রের
যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০
প্রশিক্ষণ পাবে এক লাখ বেকার ২১
চোখের যত্নে সহজ কিছু উপায় জেনে রাখুন ২২
অংকুর ২৩
শীতে প্রকৃতির কাছে ২৪
বিসিএস প্রস্তুতি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে
গণিতের মতো নম্বর ২৫
ফাউন্ডেশন সংবাদ ২৭
প্রকল্প সংবাদ ২৮
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা
বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ৩০
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩১

**সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই  সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ**

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

# উন্নয়ন ভাবনা, বৈষম্য ও আমাদের সংবিধান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ মহল এমনকি সাধারণের চায়ের আড্ডায়–সর্বত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির বিস্ময়কর উন্নতি নিয়ে হচ্ছে ব্যাপক আলোচনা। বিশ্বখ্যাত পরামর্শক সংস্থা 'পিডাব্লিউসি' একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২০১৭ সালে, যার শিরোনাম ছিল '২০৫০ সালে বিশ্ব'।

ওই প্রতিবেদন অনুসারে ভিয়েতনাম, ভারত এবং বাংলাদেশ হবে আগামী দিনে পৃথিবীর সবচাইতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ। ক্রয়ক্ষমতার সমতার (Purchasing Power Parity – PPP) ভিত্তিতে ২০৫০ সালে দেশটি হবে বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসেব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩১তম। স্বনামধন্য মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাকস এর সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন ব্রিটিশমন্ত্রী জিম ও নেইল এক গবেষণাপত্রে ব্রিকস (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa) রাষ্ট্র সমূহের পরে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে যে এগারোটি রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম।

সম্প্রতি অর্থনীতির প্রচলিত বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। বিগত একদশকের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি গড়ে ছয় শতাংশ ছিল। এটি নিঃসন্দেহে একটি অনন্য নজির। এই সময় কালে মুদ্রাস্ফীতি ছিল সহনীয় পর্যায়ে। গত দুই অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের উপরে অর্জিত হয়েছে। অন্যান্য প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৭ সালে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় যেখানে ছিল ৫৪১ মার্কিন ডলার, ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৫১৬ মার্কিন ডলারে। দশ বছরে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি!

দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ২০১০ সালে দেশে দরিদ্রের হার ছিল ৩১ শতাংশ যা ২০১৭ সালে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৩ শতাংশে। সর্বশেষ সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে দারিদ্রের হার ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে অতি দারিদ্র্যের হার যেখানে ছিল ১২ শতাংশ, ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ১১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন দেশের নীতি নির্ধারনী মহল।

দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে এখনই। যদিও দেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে তবে শ্লথ হয়ে পড়েছে দারিদ্র্য হ্রাসের হার। ২০০৫-২০১০ সাল অব্দি দারিদ্র্য হ্রাসের হার যেখানে ছিল প্রতিবছর ১ দশমিক ৭ শতাংশ, সেখানে ২০১০-২০১৬ এ সময়কালে এ হার দাঁড়ায় ১ দশমিক ২ শতাংশ।

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য–শতকরা হিসেবে দারিদ্র্য হার কমলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমেনি। ২০১১ সালে দেশে অতি দরিদ্র লোকসংখ্যা ছিল মোট ২ কোটি ৬০ লাখ। অন্যদিকে, ২০১৬ সালে অতি দরিদ্র লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৮০ লাখের মতো।

মানব উন্নয়ন সূচকেও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রতিবেদন অনুযায়ী বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে তিন ধাপ এগিয়ে ১৩৬তম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

তবে আমাদের আরও অনেকটা পথ এগোতে হবে কেননা আমাদের অবস্থান এখনও অনেকটাই নিচের দিকে–১৮৯ দেশের মধ্যে ১৩৬। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান (১৪৭) এবং নেপালের (১৪৪) চেয়ে এগিয়ে থাকলেও শ্রীলঙ্কা (৭৬), মালদ্বীপ (১০১), ভারত (১৩০) ও ভুটানের (১৩৪) চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। মূলত গড় আয়ু, ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার, লিঙ্গ সমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় বেশ ভালো।

আয় বৈষম্য, ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান, সামাজিক সাম্য ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়নের এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্ব শর্ত।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এ সকল শর্ত সমূহ পূরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? উন্নয়নের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কি না? সম্পদের বণ্টন সুষম হচ্ছে না বিশেষ কোনও গোষ্ঠী কুক্ষিগত করছে অধিকাংশ সম্পদ?

আয় বৈষম্য নিরূপণের স্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে জিনি সহগ (G ini's Coefficient)। ১৯১২ সালে ইতালীয় পরিসংখ্যানবিদ কোর্রাদো জিনি এই সূচকটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। জিনি সহগের মান সর্বনিম্ন শূন্য (০) থেকে সর্বোচ্চ এক (১) পর্যন্ত হতে পারে।

এর মান শূন্য হওয়ার অর্থ সমাজে কোনওরকম আয় বা সম্পদের বৈষম্য নেই অন্যদিকে এক (১) নির্দেশ করে চরম বৈষম্য। জিনি সহগ একটি ভগ্নাংশ। এর মান যতো কম বা শূন্যের কাছাকাছি হবে তার অর্থ হচ্ছে সমাজে বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। অন্যথা হলে অর্থাৎ মান যতো একের (১) কাছাকাছি হবে; বোঝা যাবে বৈষম্য বা অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগের মান ছিল শূন্য দশমিক ৪৬ যা ২০১৬ সালে গিয়ে দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৪৮ এ। এটা স্পষ্টতই নির্দেশ করে দেশে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও আয়-বৈষম্য বাড়ছে! এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সালে এই সূচক ছিল দশমিক ৩৬। সূচকের মান দশমিক ৫০ পেরিয়ে যাওয়াকে বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অশনি সংকেত হিসেবে দেখা হয়। বৈষম্যের এ হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ অতিদ্রুতই একটি উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশে পরিণত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত সর্বশেষ থানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬-এর তথ্য অনুসারে, দেশের মোট আয়ের ২৮ শতাংশই রয়েছে ৫ শতাংশ অতি ধনীদের হাতে। আর অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ পরিবারের আয় মাত্র দশমিক ২৩ শতাংশ (০.২৩%)! উক্ত জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১০ সালে আয়ের দিক থেকে সবচেয়ে পেছনে থাকা ৫ শতাংশ পরিবার দেশের মোট আয়ের দশমিক ৭৮ শতাংশ (০.৭৮%) আয় করত। ২০১৬ সালে তা বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়ে দশমিক ২৩ শতাংশ (০.২৩%) হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১০ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা ৫ শতাংশ পরিবারের কাছে দেশের মোট আয়ের ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ (২৪.৬১%) ছিল যা ২০১৬ সালে বেড়ে ২৭ দশমিক ৮৯ শতাংশে (২৭.৮৯%) দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ধনী মানুষের আয় আরও বেড়েছে।

পাকিস্তানি দুঃশাসন, বঞ্চনা আর চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আর মুক্তিকামী জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে। আমাদের পবিত্র সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদেরকে প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

সমাজতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল মানুষে মানুষে বৈষম্যের অবসান। এই ঐতিহাসিক দলিলের দশম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।'

সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছদে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা হলো, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে–এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।'

অর্থনৈতিক অসাম্য নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। আমাদের সংবিধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন কল্পে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। এটি কোনও জটিল বিজ্ঞান নয়। প্রয়োজন কেবল রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা।

অব্যাহত থাকুক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। লাখো শহিদের স্বপ্ন একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যবিহীন রাষ্ট্র বিনির্মাণে আমরা সকলে হই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাজ্জাদুল হাসান

opinion.bdnews24.com ২০ ডিসেম্বর ২০১৮

# শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত পিরামিডের মতো

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের পরিচয় দেওয়া যায় নানাভাবে। তিনি দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক, ভাষাসংগ্রামী, মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, সংবিধানের অনুবাদক, দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনে ছিলেন অগ্রবর্তী ভূমিকায়। বয়স ৮১ বছর পেরিয়েছে, এখনো তাঁকে রাখা যায় 'তরুণ'-এর কাতারে। গত ৬ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তনে বক্তা ছিলেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তন উৎসবে আমাকে সমাবর্তন বক্তার আসন দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। এখানে শিক্ষকতা করেছি। অবসর গ্রহণের পরেও ১৫ বছর শিক্ষকতার একাধিক পদে কাটিয়েছি এবং জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত আছি। এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমার অশেষ গর্ব। তাই এর সমাবর্তন উৎসবে একটি সম্মানের আসন লাভ করা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। তবে ভয় হয়, আমি যা বলব তা হয়তো উপলক্ষের উপযুক্ত হবে না।

পৃথিবীতে শিক্ষার, এমনকি উচ্চশিক্ষারও এমন বিস্তার লাভ হয়েছে যে উচ্চশিক্ষার ধ্যান-ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। শুনতে পাই, ইউরোপের কোনো কোনো দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত বিষয়ের জায়গায় অথবা তার পাশাপাশি আমাদের সমকালীন বিশ্বের বাস্তব সমস্যার বিষয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন জলবায়ু পরিবর্তন বা বৈশ্বিক উষ্ণতা কিংবা সুপেয় পানির সংকট। এর পশ্চাৎবর্তী যুক্তি এই যে শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণ না করে যেসব সমস্যা প্রতিনিয়ত মানবজীবনকে স্পর্শ করছে, সেসব সমস্যা সম্পর্কে এখনই চিন্তা করা দরকার। আমাদের দেশে অবশ্য এ ধরনের সংকটের বিষয় উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা সহজ নয়। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, এসব বিষয় যারা পড়বে তারা চাকরি পাবে কোথায় এবং কী সুবাদে? যেখানে অন্নচিন্তা নেই সেখানে এসব চলবে, এখানে চলবে না। কথাটা অবশ্য একেবারেই ফেলে দেওয়ার নয়, তবে ওপরে যে চিন্তাগত পরিবর্তনের বিষয়ে বলেছি, তারও সারবত্তা ভেবে দেখা দরকার।

গত ৫০-৬০ বছরে আমাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব বিষয় অধ্যয়নের জন্য যুক্ত করেছি, বাজারে যার তাৎক্ষণিক চাহিদা ছিল না। যেমন পরিসংখ্যান বা সমাজবিজ্ঞান। কিন্তু দেখা গেল যে খানিকটা প্রয়াসের ফলে এসব বিভাগের ডিগ্রিধারীরা ঠিকই কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। ১৯২১ সালে যে রসায়ন বিভাগ ছিল, তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে এখনকার মৃত্তিকা, প্রাণী ও পরিবেশ বিভাগ, ফার্মেসি বিভাগ, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিভাগ, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ, থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি বিভাগ, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে। যা তখন ছিল এক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তা থেকেও অনেক বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। কলা অনুষদের অন্তর্গত এক বাণিজ্য বিভাগ থেকে এখন ৯টি বিভাগ সংবলিত বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ গঠিত হয়েছে। দর্শনবিজ্ঞান থেকে ছেঁটে মনোবিজ্ঞান বিভাগ করা হয়েছিল। এখন তা থেকে করা হয়েছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং এডুকেশনাল কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ। এমনকি হালের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ ভেঙে গঠিত হয়েছে থিয়েটার অ্যান্ড পারফর্মিং স্টাডিজ বিভাগ, সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগ।

এ থেকে বোঝা যায়, বড় একটা বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে বিশেষায়িত অনুশীলনে আমরা কার্পণ্য করিনি। অন্যদিকে আমাদের পরিসংখ্যান বিভাগ আছে, আবার পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে। ফার্মেসি বিভাগ এবং ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ আছে, আবার ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ আছে। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ আছে, আবার কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডার বিভাগ আছে। দুর্যোগবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ আছে, আবার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারাবিলিটি ইনস্টিটিউট আছে।

আপনারা কেউ যেন মনে করবেন না, আমি এর মধ্যে কোনো বিভাগ বা ইনস্টিটিউটের আবশ্যকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। আমি বলতে চাই যে সবসময় আমরা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনা করে বিদ্যায়তনিক বিষয়ে বা একাডেমিক ডিসিপ্লিনের প্রবর্তন করি না। এমনই হওয়া উচিত। তবে আমাদের সামর্থ্যের স্বল্পতার কারণে পুনরাবৃত্তি আনয়ন দরকার। অন্যদিকে যেসব বিদ্যায়তনিক বিষয় আমরা অধ্যয়নের জন্য গ্রহণ করেছি, সেগুলো জ্ঞানের রাজ্যে এক একটি স্বয়ংসম্পন্ন দ্বীপ নয় তাও মনে রাখতে হবে। ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের, সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের, ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের, ভূগোলের সঙ্গে পরিবেশবিজ্ঞানের, পরিবেশবিজ্ঞানের সঙ্গে স্থাপত্য ও

উদ্যানতত্ত্বের, চিত্রকলার সঙ্গে চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের, নাট্যকলার সঙ্গে নৃত্যগীতবাদ্যের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে তা কিছুতেই ভুলে যাওয়া যায় না।

আমার বন্ধু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রন ইনডেনকে দেখেছি আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র বিষয় পড়াতে। যদি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে নৃত্যগীত, বাদ্য, ভাস্কর্যের পঠনপাঠন করতে হয়, যদি মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে চিত্রকলা, স্থাপত্য সম্পর্কে জানতে হয়, তবে আধুনিক ভারতের জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত চলচ্চিত্র বিষয়ে জানব না কেন?

আপনারা যদি আমার কথায় সংগতি না পান, সে দোষ আমারই।

বিদ্যায়তনিক শৃঙ্খলায় বড় বিষয় ভেঙে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান লাভ উচ্চশিক্ষার একটি উদ্দেশ্য বটে। আমি বলতে চাই, ঐক্য দরকার, আবার বিভক্তিরও প্রয়োজন আছে। ফরাসি দর্শনবিদ ও বিজ্ঞানী পাসকেল অন্য বিষয়ে যা বলেছিলেন, এ ক্ষেত্রে আমি তা তুলে ধরতে চাই। যে বহুত্ব ঐক্যে উপনীত হয় না, তা বিশৃঙ্খলা। যে ঐক্য বহুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা জুলুম। আমি দুয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষা করি। এই সঙ্গে সেই সনাতন প্রশ্নটি নতুন করে উত্থাপন করি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? আপনারা জানেন যে এ বিষয়ে মোটামুটি দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। একটির মতে, ব্যক্তির দেহমনের উন্নয়ন, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ, কোনো একটি পেশায় নিয়োজিত হতে তাকে প্রস্তুত করা, সেই সঙ্গে তার আত্মপরিচয়ের একটি ভিত্তি তৈরি করা। অপরটির মতে, ভালো নাগরিক হিসেবে তাকে গড়ে তোলা, যাতে সে সমাজের কাজে আসে তা নিশ্চিত করা, সে যেন উৎপাদনশীল মানুষ হিসেবে সমাজের উন্নয়নে অংশ নিতে পারে তার জন্য তাকে পর্যাপ্ত জ্ঞান দেওয়া, সেই সঙ্গে সে যেন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়, তা দেখা।

আমি বলব এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরকে বাতিল করে না। এর যোগফলই শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য। আমি খুব জোর দেব শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের বিকাশে। উচ্চশিক্ষা লাভ করে সে যদি ভালোমন্দ বিচার করতে না পারে এবং ভালোর পক্ষে দাঁড়িয়ে মন্দ প্রতিরোধ করতে না পারে, তাহলে তার উচ্চশিক্ষা বৃথা। জীবনে আহরিত মূল্যবোধ সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ নাও হতে পারে। শিক্ষার্থী যদি মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সর্বাগ্রে আমি তাকেই স্বাগত জানাব।

আপনারা জানেন ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষার একটি সমার্থক হলো টারশিয়ারি এডুকেশন। অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের শিক্ষা। তার মানে দুটি স্তর–প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, আমাদের দেশে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাও তার অন্তর্গত, তা অতিক্রম করে তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করতে হয়। উচ্চশিক্ষা স্বয়ম্ভু নয়, এর ভিত্তি আগের দুই স্তরের শিক্ষা। সেই দুই স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে কিছু না বলে শুধু উচ্চশিক্ষার কথা বলা বাকবিস্তার মাত্র। কিন্তু এত কথা বলার সময় কই? আমি শুধু বলব আমাদের দেশে নিম্নস্তরের শিক্ষারই অনেক ভাগ রয়েছে, তা আমাদের দুর্ভাগ্য।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রই একাধিক ধরনের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। নির্ধন শিশু ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায় প্রবেশ করার কথা কল্পনা করতে পারে না। ধনী পরিবারের সন্তান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার কথা ভাবতেই পারে না। যদিও সরকারিভাবে একটি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা দেওয়াও পাশাপাশি চলছে। তারপর রয়েছে দু ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা। সাধারণত গরিব ছেলেমেয়ে সেখানে যায়। এমনকি যাঁরা সওয়াব হাসিলের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরাও নিজেদের সন্তানদের সেখানে পাঠান না। মাদ্রাসার বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে চিন্তার বাইরে রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। উচিতও নয়। অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার বা আধুনিকীকরণের কথা বলেছেন। আপনারা আমাকে মাফ করবেন, জ্ঞান হওয়া অবধি আমি মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের কথা শুনে আসছি। আজও তা হয়ে উঠল না।

শিক্ষাব্যবস্থাটা হওয়া উচিত পিরামিডের মতো। এর ভিত্তিটা চওড়া হবে। উচ্চশিক্ষা হবে তার চূড়া। সকলে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে, সর্বাগ্রে তা দেখা দরকার। আমি আসলে অন্য কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য তা আবশ্যক, কিন্তু এ ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া যায় না। ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রার্থিত মানে উন্নীত হতে পারছে না। তারা যখন শিক্ষার তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন এই দুর্বলতা আর দূর করে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বলা হতে থাকে যে এ দেশে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটেছে। তবে উচ্চশিক্ষার মানের অবনমন সম্পর্কে কর্মে নিয়োগকর্তারা এখন যেভাবে সমস্বরে কথা বলছেন তা আগে শোনা যায়নি।

আমাদের উচিত বিষয়টি বিবেচনা করা এবং তার প্রতিকার খুঁজে পাওয়া। পৃথিবীতে জ্ঞানের যে বিস্ফোরণ ঘটছে, তা যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। ফলে আমাদের লব্ধ জ্ঞানের অনেকটাই প্রতিনিয়ত বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হচ্ছে। জ্ঞানের সৃষ্টিতে আমরা তেমন অগ্রসর হতে পারিনি। তবে যে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে তা আয়ত্ত করতে আমরা চেষ্টা করছি। সে প্রয়াস তীব্র না হলে আমাদের শিক্ষার্থীরা সত্যি সত্যি পিছিয়ে পড়বে। তবে আমি জোর গলায় বলব, এখনকার ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের কালের ভালো শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক ভালো। শ্রেণিকক্ষের বাইরে জ্ঞান আহরণের জন্য যে সুযোগ তারা পেয়েছে, আমাদের কালে তা ছিল না। এমনই কিছু উজ্জ্বল ছেলেমেয়ে এই সমাবর্তনে ডিগ্রি লাভের উৎসব করতে এসেছে। আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের।

গ্র্যাজুয়েটদের কাছে আমার একটাই নিবেদন, তোমরা ভুলে যেও না তোমাদের আজকের কৃতিত্বের মূলে আছে তোমাদের পরিবার, তোমাদের শিক্ষায়তন, তোমাদের এই গরিব দেশ। তোমরা পৃথিবীর যেখানেই থাকো, যে অবস্থায় থাকো, পরিবার ও দেশের কাছে তোমাদের ঋণের কথা ভুলে যেয়ো না। সাধ্যমতো চেষ্টা কোরো সে ঋণ পরিশোধ করতে। এ কথা জেনো, তোমরা বাংলাদেশের সেই স্বল্প সৌভাগ্যবান মানুষদের মধ্যে স্থান লাভ করেছ, যারা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে। মনে রেখো, দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো সাক্ষরতার সুযোগ বঞ্চিত। পারলে তাদের জন্য কিছু করো। তারা তোমাদেরই ভাইবোন।

আনিসুজ্জামান

প্রথম আলো ১৪ অক্টোবর ২০১৮

# স্বাধীনতার প্রথম আলো

মো. শাহজালাল জুয়েল
সদস্য ৪৭৭/২০০২

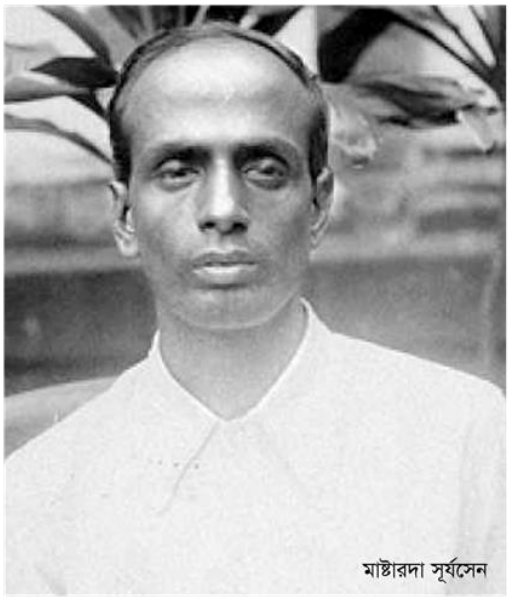
মাষ্টারদা সূর্যসেন

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ চায় স্বাধীনতা। কিন্তু একটা শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরে, তখন সে তার জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা চাইতেই পারে। তেমনি একজন পরাধীন সন্তান তার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এবং অন্যদেরকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। নাম তার সূর্যসেন। বাংলার ছায়াঘেরা সবুজ শ্যামল প্রকৃতির মাঝে ছোট্ট একটি গ্রাম নোয়াপাড়া। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত। এই গ্রামেই শশীবালার ঔরসে ১৮৯৪ সালের ২২ মে বুধবার সূর্যসেন জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলে অক্ষরজ্ঞান পাকা করে শহরের নন্দনকানন ন্যাশনাল স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এরপর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন এবং দক্ষতার সাথে বি.এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় সূর্যসেন দেখেছেন বাংলায় ব্রিটিশদের অনাচার, অত্যাচার, শোষণ, শাসনের স্টিম রোলার, দেখেছেন ধুঁকে ধুঁকে মরতে বাংলার সাধারণ মানুষকে।

১৯১৭ সালে সূর্যসেন যখন ভালো রেজাল্ট করে বি.এ পাশ করেন তখন তিনি চট্টগ্রামের দেওয়ান বাজারের উমাতারা ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে অংক শিক্ষকের চাকুরিতে যোগ দেন। পরিবারের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সূর্যসেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকতার চাকরিটাই বেছে নেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে একটা গোপন বিপ্লবী দল তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। দুজন ছাড়া বাকি সবাই গ্রেফতার হলে সূর্যসেন তখন তাদের সাথে যোগ দেন। বিপ্লবের স্বচ্ছ চিন্তা, বিচক্ষণতা, মেধা থাকার কারণে সূর্যসেন দ্রুত নেতা হয়ে উঠলেন। সূর্যসেনে সম্মোহনী ক্ষমতার কারণে ছোট দলে অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন বিকাশ দত্ত সহ আরও অনেকে যোগ দেন।

সূর্যসেন যখন স্কুলে শিক্ষক তখন তিনি ছাত্রদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা করেন ও অল্প দিনে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। স্কুলের ছাত্ররা সূর্যসেনকে 'মাস্টারদা' সম্বোধন করতে শুরু করল এবং সূর্যসেনের কাছে পছন্দসই ছিল।

এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল প্রচুর টাকা। সূর্যসেনের নির্দেশে দলের সবাই নিজের ঘর থেকে টাকা সংগ্রহ করে সংগঠনকে দিত। এভাবে ১৯২৩ সালের দিকে সূর্যসেনের হাতে জমেছিল বেশ কিছু টাকা। এই সময়ে কিছু বিপ্লবী চট্টগ্রামের উত্তর শহরতলীর বহদ্দারহাটের একটি পরিত্যাক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বাড়িটির নাম ছিল 'সুলুক বাহা'। বাড়িটি ছিল গাছপালা দিয়ে ঘেরা সুন্দর, নিরাপদ আশ্রয় বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য।

চট্টগ্রাম শহরের একটা পাহাড়ের উপর ছিল ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হেড অফিস। হাজার হাজার শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করত কারখানাতে। প্রতি মাসে অন্তত দুবার তাদের বেতন নিয়ে যাওয়া হতো পাহাড়ঘেরা রাস্তা দিয়ে। অনন্ত সিংহ কয়েকদিন যাবৎ পর্যালোচনা করে সুর্যসেনকে ব্যাপারটি জানান। সূর্যসেন সম্ভাবনা দেখে আক্রমণের সম্মতি দেন।

দিনটি ছিল ১৯২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর। সকাল পৌনে দশটার দিকে অনন্ত সিংহ সহ চারজনের একটি দল ওৎ পেতে ছিল। ঘোড়ার গাড়িটি কাছে আসলে অনন্ত সিংহ দুর্দান্ত সাহস নিয়ে চালকের বুক বরাবর পিস্তল ঠেকিয়ে প্রায় ১৭ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। এই ঘটনার কিছুদিন পর 'সুলুক বাহার' বাড়িটি পুলিশের আক্রমণের শিকার হয়। সূর্যসেন আগে থেকেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন বলে তার লোকদেরকে সরে যেতে বলেছিলেন। পূর্ব পটিয়ার পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে ঢোকার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পালাবার সময় তারা গ্রামের সাধারণ লোকদের বাধার সম্মুখীন হন। কিন্তু সূর্যসেনের নির্দেশে তারা কিছু করেননি। আর এই ঘটনার পর অনেকে সূর্যসেনকে সন্ত্রাসী বলে মনে করতেন। আসলে তা ছিল তাদের এক মস্ত ভুল ধারণা। এভাবে কয়েক ঘণ্টা ছুটবার পর তারা যখন জঙ্গলে এসে পৌছালেন তখন তারা পুলিশের মুখোমুখি হন ও গুলি বিনিময় করতে বাধ্য হন। সারাদিন যুদ্ধ, দীর্ঘ চৌদ্দ মাইল পাড়ি দিয়ে যখন সবাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তখন সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী উপায়ান্তর না দেখে বিষপান করেন। কিন্তু বিষক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু খোদা লিখে রাখেননি। তারা পুলিশের হাতে বন্দি হন ও বিচারের সম্মুখীন হন। বিচারে তাদের দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালতে তাদেরকে খালাস দেয়। এরপর সূর্যসেন আরো সতর্ক হন। তিনি দলের সবাইকে বক্সিং, জুজুৎসু, গোপনে খরস্রোতা কর্ণফুলী নদী পার হওয়া, নৌকা চালানো, গাছে চড়া, অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করতে থাকেন।

২৫ অক্টোবর ভোরবেলা। পুলিশ সারাদেশ থেকে দুশো স্বাধীনতা কর্মীকে গ্রেফতার করল। ঐদিন অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ সহ অনেকে গ্রেফতার হন। সেদিন মাস্টারদা বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। মাস্টারদা কলকাতার একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বিপ্লবের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। বাড়িটিতে বোমা ও পটকা তৈরি হতো। বাইরে থেকে তেমন কিছু বোঝা যেত না।

১৯২৬ সালের ১০ নভেম্বর সূর্যসেন দেখলেন পুলিশ বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। সূর্যসেন তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন ছদ্মবেশে পালাতে হবে। আর তিনি গায়ে গামছা দিয়ে কেটলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সদর দরজায় প্রহরারত পুলিশ তাকে সন্দেহ করল। পুলিশ তাকে চাকর ভেবে ছেড়ে দেয়। সূর্যসেন ঐ যে চা আনতে গেলেন তাঁর ফিরে এলেন না।

পরবর্তীতে সূর্যসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করেন কলকাতার একটি রাস্তা থেকে। তবে ইতোমধ্যে এক বছর কেটে গিয়েছিল। তখন ১৯২৮ সালের শেষ পর্যায়ে। পুলিশ সূর্যসেনকে বন্দি করে পাঠিয়ে দেন বোম্বের রত্নাগিরি জেলে। কেননা তারা সূর্যসেনকে কলকাতায় রাখার সাহস পাচ্ছিল না। ১৯২৮ সালের মাঝামাঝিতে সূর্যসেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা অসুস্থ হয়ে পড়লে মাস্টারদাকে চট্টগ্রাম জেলে আনা হয় এবং শ্বশুর বাড়িতে কিছুদিন থাকতে দেয়া হয় তখন তার স্ত্রী মারা যায়। তার কিছুদিন পরে সূর্যসেন ছাড়া পান।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সূর্যসেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে ঢেলে সাজান। তিনি প্রথমে চট্টগ্রামকে স্বাধীন করার প্রতি জোর তাগিদ দেন। চট্টগ্রামে তখন একটি পুলিশ অস্ত্রাগার ছিল। বিপ্লবীরা সেই অস্ত্রাগারটি দখল করতে চাইলেন। সাথে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের একটি অস্ত্রাগার দখল করে নিতে চাইলেন। বিপ্লবীরা জানতেন এর ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না, তবে স্বাধীনতার একটা পথ উন্মুক্ত হবে।

দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি শেষে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে তারা আক্রমণের জন্য তৈরি হলো। তখন চলছিল ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন। ১৮ এপ্রিল। চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মহান দিন। বাঙালি সত্ত্বার এক গৌরবের দিন।

১৮ এপ্রিলের রাতে ছয় জনের একটি সুসজ্জিত দল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারটি আকস্মিক দখল করে দেয়। তারা সামরিক সাজে সজ্জিত ছিল বলে প্রহরীরা বুঝতে পারেনি। ফলে তাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। এমন করেই সাত আট জনের আরো একটা সজ্জিত, সংগঠিত দল পাহাড়তলীর অস্ত্রাগারটিও দখল করে নেয়। ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত বিপ্লবীরা একসঙ্গে অস্ত্রাগারে জমা হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। জাতীয় পতাকার সম্মানে তারা তিনবার বন্দুকের ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এই সময়ে মাস্টারদা ঐ পতাকাতলে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন চট্টগ্রাম আজ স্বাধীন। দুশো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে আজ মুক্ত। চট্টগ্রামের একটা পাহাড়ে সূর্যসেনসহ অনেক আশ্রয় নেন।

বন্দরে অবস্থানরত একটা জাহাজ থেকে কলকাতায় জানানো হলে

২২ এপ্রিল এক বিরাট ফৌজ বন্দরে এসে হাজির হয়। ২২ এপ্রিল তারা জালালাবাদে বিপ্লবীদেরকে ঘিরে ফেললে সূর্যসেন ও লোকনাথ বলের আক্রমণে তারা পিছু হটে। ঐ যুদ্ধে ১২ জন বিপ্লবী শহিদ হন। তারপর সাধারণ মানুষের কাছে বিপ্লবীরা প্রচুর সাহায্য পান। ২৩ এপ্রিল ফতেহাবাদ এলাকার পাহাড়ে বিপ্লবীরা আশ্রয় নেন। লোকনাথ বলের নির্দেশে পাহাড়ের চারপাশে অবস্থানরত বিপ্লবীরা একসঙ্গে রাইফেলের আগুন ঝরায়। শেষ পর্যন্ত শত্রুদের ভারী কামানের কাছে টিকতে না পেরে লোকনাথ বল, ছোট টেগরা শহিদ হন। তার পরপরই ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, নির্মল লালা, প্রভাস বল, নরেশ রায়সহ অনেকে শহিদ হন।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সূর্যসেন সহ আরও অনেকে আত্মগোপন করেন এক বাড়িতে। তাকে ধরার জন্য ১০ হাজার টাকা ঘোষণা দিলে এক মহিলা তাকে ধরার জন্য পুলিশকে সহায়তা করেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সূর্যসেনের বিচার হলো। রায় হলো ফাঁসির। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি রায় কার্যকর হলো।

উাসির মঞ্চে সূর্যসেন গেয়ে গেছেন দেশের গান। শ্রদ্ধা জানিয়েছিল দেশের হাজার হাজার মানুষ। সূর্যসেনের শেষ মন্তব্য ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে–'সঙ্গীরা, তোমরা এপ্রিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, কখনো পিছে ফিরো না।'

সূর্যসেনসহ আরও অনেকে যে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে গৌরবময় ভূমিকা রেখেছিল তাদের কথা জাতি কোনোদিন ভুলবে না। তারা অমর হয়ে থাকবে বাঙালির হৃদয়ে। যুগ যুগ ধরে তারা অনুপ্রেরণা যোগাবে বিপ্লবের। করবে মানুষকে স্বাধীনতা সচেতন।

নবীন, জানুয়ারি-জুন ২০০৬ সংখ্যা থেকে নেওয়া

# কেমন হতে পারে এক হাজার বছর পরের মানুষ

প্রথমেই উল্লেখ করে রাখা দরকার, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনযাপন কেমন হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এদের কোনো একটাতে সামান্য পরিবর্তন হলে সামগ্রিকভাবে বড় ধরনের এদিক-সেদিক হয়ে যায়। অনেকটা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। আবহাওয়া কেমন হবে তা পরিবেশের অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে। এসব উপাদান বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া সম্পর্কে আনুমানিক একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কিন্তু উপাদানের কোনো একটায় সামান্য এদিক-সেদিক হলে পুরো প্রক্রিয়াটাই উলট-পালট হয়ে যায়। সেজন্যই আবহাওয়ার কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই নিখুঁতভাবে দেয়া যায় না। অনেকটা বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব বা কেওস থিওরির মতো। কেওস থিওরিতে 'বাটারফ্লাই ইফেক্ট' নামে মজার একটি বিষয় আছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে যদি একটি প্রজাপতি ডানা ঝাপটায় এবং সেই ঝাপটা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ফিডব্যাক পায় তাহলে সেটি পৃথিবীর অপর প্রান্তে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম দিতে পারে। উদ্দেশ্যহীন বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র কিছু ঘটনা উপযুক্ত সময়ে পজিটিভ ফিডব্যাক পেলে তা থেকে জন্ম নিতে পারে বিশাল কিছু।

আবহাওয়া আজ শান্ত আছে, কাল আপাতদৃষ্টিতে কোনো কারণ ছাড়াই অশান্ত হয়ে যেতে পারে। ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আসবে বলে সবাই ভয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে গেছে, কিন্তু পরে দেখা গেল হুট করেই ঘূর্ণিঝড় উধাও কিংবা ইউ টার্ন নিয়ে ফিরে গেছে উল্টো দিকে। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করাও অনেকটা কেওস থিওরি কিংবা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। তারপরেও অনুমান করতে তো আর কোনো সমস্যা নেই। বর্তমান প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে সেরকমই কিছু অনুমান করা হয়েছে এক হাজার বছর পরের মানুষ সম্পর্কে।

মানুষের মাঝে সদা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শরীরেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কোনো অঞ্চলে যদি সূর্যের উত্তাপের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে রোদের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। ত্বকে মেলানিনের উপস্থিতি বেশি থাকলে ত্বক কালো হয়ে যায়। সেজন্যই দেখা যায়, যে অঞ্চলে গরম বেশি সে অঞ্চলের মানুষ অপেক্ষাকৃত কালো হয়। কোনো অঞ্চলে শীতলতার পরিমাণ বেশি হলে ত্বকের নীচে শীত প্রতিরোধক চর্বির স্তর বেড়ে যায়।

ইতিহাসের পথে পথে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য অনেক ভাঙা-গড়া ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে মানুষকে। এবং এই প্রক্রিয়া থেমে যায়নি, এখনো চলমান আছে। প্রক্রিয়া যেহেতু চলমান, তাই একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে– ভবিষ্যতে মানুষের মাঝে কী কী পরিবর্তন সাধিত হবে?

দেখতে-শুনতে, আকার-আকৃতিতে কেমন হবে ভবিষ্যতের মানুষ? কেমন হবে এক হাজার বছর পরের মানুষের রূপ?

মানুষ বর্তমানের তুলনায় অনেকখানি লম্বা হবে। গাণিতিক বাস্তবতা এমনই বলে। গত ১৩০ বছরে মানুষের উচ্চতা বেড়েছেও বেশ খানিকটা। ১৮৮০ সালের দিকে আমেরিকার পুরুষদের গড় উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। এখন তাদের গড় উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। এক হাজার বছর সময়ের ব্যবধানে উচ্চতার এই পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য হিসেবেই দেখা দেবে বলে ধারণা করা হয়।

কানের মাধ্যমে শোনা, চোখের মাধ্যমে দেখা, নাকের মাধ্যমে ঘ্রাণ অনুধাবন করা সহ দেহের অন্যান্য কার্যপ্রণালীতে পরিবর্তন আসবে। যেমন বর্তমানে 'হিয়ারিং এইড' নামে একটি যন্ত্র আছে যেটি কানে সমস্যা সম্পন্ন মানুষদেরকে শুনতে সাহায্য করে। এই যন্ত্র সাধারণ শব্দ রেকর্ড করে সেটিকে ক্ষতিগ্রস্ত কানের উপযোগী শব্দে রূপান্তরিত করতে পারে। এমনকি এর সাথে সংযুক্ত মোবাইলে তা লিখিতরূপেও প্রদান করতে পারে।

চোখের কথা বিবেচনা করতে পারি। আগে কোনো দাতা ব্যক্তি চোখ দান করলে তা দিয়ে অন্য কারো চোখের চিকিৎসা করা হতো কিংবা অন্ধের চোখে লাগানো হতো। কদিন পরে এই সীমাবদ্ধতা আর থাকবে না। ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক 'বায়োনিক

চোখ' নামে একধরনের যন্ত্র তৈরি করছেন যার মাধ্যমে অন্ধরাও দৃষ্টি ফিরে পাবে। যন্ত্রের মাধ্যমে একজন জলজ্যান্ত মানুষ দেখতে পাচ্ছে এই ব্যাপারটা কম অভাবনীয় নয়।

এতটুকু যেহেতু সম্ভব, হয়েছে, এটির দৃষ্টির পরিব্যাপ্তি বাড়ানোও অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নয়। মানুষের চোখ তড়িৎচুম্বক বর্ণালীর খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ দেখতে পায়। বর্ণালীর 'দৃশ্যমান আলো'র বাইরে অনেক বড় একটা অংশ অধরাই থেকে যায় সবসময়। এমনও হতে পারে বায়োনিক চোখের উন্নতির মাধ্যমে দৃশ্যমান আলোর বাইরের আলোও মানুষ দেখতে পারবে। যেমন ইনফ্রারেড কিংবা এক্সরে। এই দুই ধরনের আলোতে মানুষের চোখ সংবেদনশীল হলে জগতের অনেক অজানা রাজ্য, অচেনা ভাণ্ডার মানুষের সামনে চলে আসবে। যে জিনিসগুলো মানুষের চোখে আজকে অদৃশ্য সেগুলো তখন হয়ে যাবে দিনের আলোর মতো সত্য। যেমন ইনফ্রারেড রশ্মি বা অবলোহিত আলোর প্রতি চোখ সংবেদনশীল হলে মানুষ অন্ধকারেও দেখতে পাবে।

শুধু দেহের বাইরের দিক থেকেই নয়, ভেতরের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পর্যায়েও পরিবর্তন আসবে। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য আণুবীক্ষণিক পর্যায়ে আমাদের জিনও পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে। যেমন– অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক আফ্রিকায় এমন কিছু শিশুর সন্ধান পেয়েছেন যারা HIV-তে আক্রান্ত হয়েও দিব্যি সুস্থ জীবন পার করছে। তাদের জিনে এমন কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যেটি HIV ভাইরাসকে প্রতিহত করে দেয় এবং দেহ থেকে এইডসকে দূরে রাখে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ ল্যাবরেটরিতেও জিনের কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে পারে। জিনের কোন অংশে কোন ধরনের সম্পাদনা করলে কোন রোগ প্রতিহত হবে এটা জানতে পারলে মানুষ নিজেরাই দেহের মাঝে অনেক নিশ্চিত প্রাণঘাতী রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার মানুষের বৃদ্ধ হবার প্রক্রিয়াকেও থামিয়ে দেয়া সম্ভব। তখন সকল মানুষ হবে চির তরুণ। সম্ভাবনাময় এই প্রযুক্তির নাম হচ্ছে CRISPR।

এটা ছাড়া এমনিতেও মানুষের অসুস্থ হবার হার কিংবা অসুস্থ হয়ে মারা যাবার হার কমে যাবে। তখন মানবদেহের চিকিৎসায় চলে আসবে ন্যানো রোবট বা সংক্ষেপে ন্যানোবট। শরীরের ভেতরে যে অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা যে অংশটি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত সে অংশে ক্ষতি পূরণ করতে কিংবা জীবাণুদের সাথে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেয়া হবে এদেরকে।

মানুষ যদি ক্রমান্বয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটাতেই থাকে তাহলে পৃথিবীর ওজোন স্তরের বাধ ভেঙে পড়বে। এই স্তর সূর্যের ক্ষতিকর বিকিরণকে শোষণ করে নেয়। এটি না থাকলে সূর্যের ক্ষতিকর বিকিরণের প্রভাব পড়বে মানুষের উপরে। অন্যান্য পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের ত্বক কিছুটা কালচে হয়ে যাবে।

পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে অন্য কোনো গ্রহে মানব বসতি স্থাপন করা এখন কল্পনার গণ্ডি ছাড়িয়ে বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এক হাজার বছরের মাঝে গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ হয়ে যাবে আজকের দিনে পিকনিক স্পটে ভ্রমণের মতো। বেশি দূরে না গিয়ে মঙ্গল গ্রহের কথাই বিবেচনা করি। মঙ্গল গ্রহে মানুষ বসবাস করার জোর সম্ভাবনা আছে। সেখানে বসবাসকারী মানুষের শারীরিক পরিবর্তন, পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের শারীরিক পরিবর্তনের চেয়ে ভিন্নভাবে হবে।

মঙ্গলে সূর্যের আলোর পরিমাণ কম। পৃথিবীর আলোর প্রায় তিনভাগের একভাগ আলো পড়ে সেখানে। যার মানে হচ্ছে এই গ্রহে দেখতে সমস্যা হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য চোখের মণি বড় হবে। মণি বড় হলে চোখে বেশি আলো প্রবেশ করবে। বেশি আলো প্রবেশ করলে কোনোকিছুকে স্পষ্টতর দেখা যাবে। মঙ্গলের অভিকর্ষীয় টানও পৃথিবীর তুলনায় কম। সেখানে কেউ গেলে পৃথিবীর অভিকর্ষীয় টানের মাত্র ৩৮% অনুভব করবে। তাই সেখানে যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের উচ্চতা হবে অনেক বেশি। নিচের দিকে টান কম থাকাতে শিশু লম্বা হয়ে উঠবে তরতরিয়ে।

মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে একধরনের অর্ধ-তরল পদার্থ (fluid) থাকে। এরা কশেরুকাগুলোকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখে। পৃথিবীর অভিকর্ষীয় আকর্ষণে এরা ভালোই চাপে থাকে। কেউ যদি মহাকাশে বা মঙ্গল গ্রহে যায় তাহলে এদের মাঝে প্রযুক্ত চাপ কম পড়ে এবং এরা স্ফীত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় একজন স্বাভাবিক মানুষের উচ্চতাও কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। মঙ্গলে যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের উচ্চতা যে বেশি করে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

এক হাজার বছরের ভেতরে এসবের চেয়েও অনেক বড় এবং অনেক আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসতে পারে। অমরত্ব, এটি অর্জনের প্রথম ধাপ হতে পারে মানুষের চেতনা বা কনশাসনেসকে বিশেষ উপায়ে যান্ত্রিকভাবে সংগ্রহ করা। চেতনাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপ দিতে পারলে সেটিকে পরবর্তীতে কোনো যন্ত্রে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। ইতালি ও চীনের বিজ্ঞানীরা এর সাথে সম্পর্কিত কাজে অগ্রগতিও অর্জন করেছেন। এক প্রাণীর মাথা আরেকটি প্রাণীর দেহে স্থাপন করে দেখছেন সেসব প্রাণীর মস্তিষ্ক বা চেতনা ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কিনা। তারা আশা করছেন, মানুষের মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন হবে তাদের কাজের পরবর্তী লক্ষ্য।

যেরকম বলা হয়েছে মানুষের পরিবর্তন হয়তো ভবিষ্যতে সেরকমই হবে কিংবা এর কাছাকাছি রকম হবে কিংবা হয়তো একদমই ভিন্নরকম হবে! তবে যেরকমই হোক, মানুষের মাঝে পরিবর্তন সংঘটিত হবেই। বিবর্তনের অমোঘ নীতি অনুসারে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যে যত দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারবে সে তত সফলভাবে টিকে থাকতে পারবে। যারা খাপ খাওয়ানোর জন্য নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনতে পারবে না, তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরিবেশে টিকে থাকার জন্য দেহে পরিবর্তন সাধিত হওয়া খারাপ লক্ষণ নয়। এরা নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার সুখবরই বহন করে।

Sirajam Munir Shraban
roar.media

# উপদেশ-কূপদেশ

শওকত ওসমান

## সবুরে মেওয়া ফলে

এই উপদেশটি প্রবাদের পর্যায়ে উন্নীত। কারণ, বহু অভিজ্ঞতা থেকেই অতীতের মানুষ ওই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। বর্তমানেও তা বাসি হয়ে যায়নি। লেখাপড়া শেখার কথাই ধরা যাক।

একজনের বিএ পাশ করতে বা গ্র্যাজুয়েট হতে কত বছর লেগে যায়। বিশ-একুশ বয়সের পূর্বে কেউ ওই ডিগ্রি অর্জন করতে পারে না।

সুতরাং কত ধৈর্য্যেও প্রমাণ কল্পনা অবাস্তব। পরীক্ষার পরে দেখা যায়, অকৃতকার্যতার জন্যে কিছু ছাত্র আত্মহত্যা করে। এখানে নানা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ছাত্রটির ধৈর্য্যেরও অভাব ছিল, তা এক বাক্যে বলা যায়। নাহলে এমন অমূল্য মানব-জীবন একটা তুচ্ছ কারণের জন্যে খোয়ার করে দিত না। তুচ্ছ কারণ ছাড়া কী? মানব-জীবনের চেয়ে কোনো কিছুই অমূল্য নয়। অথচ পাশ করতে পারেনি, এই অজুহাতে সে প্রাণ দিয়ে দিলে।

সবুর ছাড়া মেওয়া ফলানো দায়। একটি ডাক্তার কি বৈমানিকের (পাইলট) কতো বছর না কেটে যায় লেখাপড়া এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে। আইএএসসি পাশ করার পাশ করার পারও একজনের ডাক্তারী ডিগ্রি নিতে পাঁচ বছর অন্তত লাগে। এই ধৈর্য্য এক জনকে ধারণ করতে হবে, যদি কেউ ডাক্তার হতে চায়। এসব ছাড়াও জাতির জীবনে বহু দিন গেলে যেতে পারে কোনো উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনে। তাই বলা হয়, রোম একদিনের তৈরি হয়নি। Rome was not built in a day.

যদি কৃষিপ্রধান দেশকে যন্ত্রশিল্প-প্রধান দেশে উন্নীত করতে হয়, তার জন্যে পুঁজি দরকার। পুঁজি আসবে কোথা থেকে? মানুষকে তখন সবুর করতে হয়। শুধু সবুর নয় তার সঙ্গে ত্যাগ অপরিহার্য। এক জাতি বছরে যা উৎপাদন করে তার যদি সব খেয়েই ফেলে তাহলে ভবিষ্যতের জন্যে আর কিছু থাকে না। তাদের উন্নতির পথ বন্ধ। এই জন্যে ত্যাগ প্রয়োজন নয়। শুধু ব্যক্তি নয়, গোটা জাতিরও অনেক সময় সবুর করা ছাড়া উপায় থাকে না। আগামী বছর যদি ধান-চাল আবার পেতে হয়, এবছর যত ধান হয়েছে তার কিছু বীজ ধানের জন্যে সঞ্চয় রাখতে হবে। এই সঞ্চয় মানে ত্যাগ। অর্থাৎ, তখনই খেয়ে ফেললে চলবে না।

মোদ্দা কথা, কি ব্যক্তিজীবনে কি জাতীয় জীবনে সবুর ধৈর্য্য অপরিহার্য। অভিজ্ঞতা থেকে অমন সিদ্ধান্ত বা প্রবাদেও জন্ম। সুতরাং কেউ যদি উপদেশ দেয়, সবুর করো, তা শিরোধার্য।

কিন্তু সেখানেই সমস্যা। সবুরের মেয়াদ কত দিন হবে? পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর? বা, আরো বেশি? ফ্যাসাদ বা ফ্যাঁকড়া সেইখানে।

আমরা ইংরেজের গোলাম অর্থাৎ অধীন ছিলাম প্রায় দুশ বছর। পরাধীন থাকার দূরবস্থা বাংলাদেশের কোন তরুণকে বোঝানো নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্মই দাসত্বের শৃঙ্খল-মোচন মারফৎ।

দুশ বছর রাজত্ব করে গেল ইংরেজ। এতদিন নিশ্চয় উপমহাদেশের অধিকাংশ লোক সবুর করে বসেছিল। আবার কিছু লোক ছিল যারা সবুর করতে চায়নি তারা যুগ যুগ লড়ে গেছে। জুতো-পেটা খেয়েও মানুষ বেঁচে এবং বিদ্রোহ করে না। কারণ, তারা তখন মনে করত যে ওই জুতো-পেটা খাওয়া সম্মানজনক। অনেকে মনে করত, তা বিধাতার নির্দেশে। সুতরাং পরিবর্তন করা যাবে না। করার চেষ্টা অন্যায় বা পাপ।

এখন দেখা যাচ্ছে, এই বে-সবুর দলের লোকেরাই দেশের প্রকৃত সন্তান এবং হিতাকাঙ্খী। তারাই প্রাতঃস্মরণীয়। অন্যেরা আত্মস্বার্থপর দালাল। জাতির কলঙ্ক।

সুতরাং সবুরে মেওয়া ফলে কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। উপদেশ দিলেই তা সহজে মনে চলতে হবে– এমন ধারণা অমূলক। অর্থাৎ, উপদেশও ক্ষেত্রে বিশেষে উল্টো ফল ফলায়। তা-কে যদি আমরা 'কূপদেশ' আখ্যা দিই, তাহলে আদৌ ভুল করব না।

একটা উপদেশ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু সব উপদেশ সম্পর্কেই ওই মাপকাঠি প্রযোজ্য। পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থা সেখানে বিচার্য। নচেৎ আক্ষরিক অর্থে কোনো উপদেশ পালন করা বিপজ্জনক। সবুরে মেওয়া ফলানোর ফাঁদ পেতে ইংরেজরা দুশ বছর টিকে গেল। টিকে গেল মানে রাজত্ব করে গেলে। আর বিদেশি রাজত্বের মানে অনেকে বুঝতেও শেখেনি। ব্রিটিশ আমলে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে একজন এসপি অর্থাৎ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টও এদেশি হতে পারত না। চাকরির সীমা এমনই সংকীর্ণ। কারণ, নিজেদের রাজত্বেও নিরাপত্তার ভার ও দেশি লোককে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া ইংরেজের পক্ষে অবম্ভব। আগেই বলেছি, সবুর না করার দলে অর্থাৎ অধৈর্য্য কিছু মানুষ যদি না থাকত তাহলে আজও আমরা। ইংরেজের গোলাম থাকতাম। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটত না স্বাধীন জাতির দেশ হিসেবে বিশ্বে মানচিত্রে। তা পূর্ব পাকিস্তানই থেকে যেত।

ক্ষেত্রবিশেষে উপদেশ মানুষকে মানসিকভাবে আর এগোতে দেয় না। ইংরেজদের গোলাম থাকার মধ্যেই দুই শতাব্দী ধরে কত মানুষ না আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য আজও বহু লোক বাংলাদেশে অনুতপ্ত। তারা অতীতের ক্রীতদাসদেরই বংশধর। গোলামীজাত চেতনা মুছে ফেলতেও বহু বছর লেগে যায়।

উপদেশ সম্পর্কে তাই প্রচুর সতর্কতা লাগে। নচেৎ ফল বিপরীত হতে পারে। তার বিশদ ব্যাখ্যা আর নিষ্প্রয়োজন।

শুধু জাতীয় জীবনে নয়, ব্যক্তির জীবনে কী ঘটে তাও জেনে রাখুন একটি গল্পের মাধ্যমে। ওই বিদেশি কাহিনি মৎ-কর্তৃক পুনর্লিখিত। অফশোস লেখকের নাম আমার মনে নেই।

বাপ ছেলেকে প্রতিদিন প্রচুর উপদেশ দেন, নসিহৎ করেন। বিশেষত পুত্র যখন বাড়ির বাইরে যায়। তখন নানা সতর্কতার ছড়াছড়ি গাড়িঘোড়া দেখে রাস্তা পার হবি। ডাইনে বাঁয়ে চোখ রাখবি। গাড়ি-চাপা পড়ে বছরে কতো লোক মারা যায় শুধু অসাবধানতার জন্যে। এই জাতীয় উপদেশ বাড়ি থেকে বেরুনোর পূর্বে ছেলের কানে বর্ষণ হতো।

সন্তান বালক ছিল, কিশোর হলো। যথারীতি জওয়ান এবং পরে দায়িত্বশীল নাগরিক।

নাগরিক সন্তান। পথ হাঁটে খুব সাবধানে। সে সারা জীবন আর আকাশ দেখল না।

# তোমাদের আমার হিংসা হয়

মাইক্রোসফটের সহ প্রতিষ্ঠাতা পল অ্যালেন। গত ১৫ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেছেন এই মার্কিন ব্যবসায়ী। ২০১৭ সালের ৯ মার্চ ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক্যাম্পাসে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি।

আমরা একই ধরনের চ্যালেঞ্জ ভালোবাসি বলেই, মনে হচ্ছে খুব কাছের মানুষদের সামনে কথা বলছি। এই ক্যাম্পাস আমার নিজের ঘরের মতো। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির প্রধান দায়িত্বে ছিলেন আমার বাবা। ছোটবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছি এই লাইব্রেরিতে। বইয়ের স্তূপের মধ্য থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে আমি পড়তাম, বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নতুন কী এল, কী হলো। গ্র্যাজুয়েট কম্পিউটার সায়েন্স ল্যাবে কাটত অধিকাংশ সময়। সেখানে অবশ্য আমার থাকার কথা নয়। কারণ তখন আমি সবে হাইস্কুলে পড়ি। হাইস্কুলে পড়লে যা হয় আর কি, কিছুদিন পর আমি আমার বন্ধুদেরও লাইব্রেরিতে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করলাম। এই ঘটনার আগ পর্যন্ত অধ্যাপকেরা আমার উপস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন।

আমাদের বের করে দেওয়ার জন্য কম্পিউটার ল্যাবের পরিচালক ড. হেলমিক গোল্ডি যে চিঠিটা লিখেছিলেন, সেটা আমার কাছে এখনো আছে। চিঠির কয়েকটা লাইন পড়লে আজও হাসি পায়। 'প্রিয় মিস্টার অ্যালেন' সম্বোধন দিয়ে শুরু হলেও চিঠির বাকি অংশে লেখা ছিল, কী কী কারণে তিনি আমাদের বের করে দিতে চান। প্রথম অভিযোগ: আমরা সবকটি টার্মিনাল দখল করে রাখতাম। আমাদের কোলাহলের কারণে বাকিদের কাজে অসুবিধা হতো। দ্বিতীয় অভিযোগ: আমার দুই বন্ধু যন্ত্রপাতি নেওয়ার নিয়মকানুন ঠিকভাবে মানেনি। তৃতীয় অভিযোগটা খুবই গুরুতর। অধ্যাপক লিখেছিলেন, 'কয়েক দিন আগে বিনা অনুমতিতে তোমরা ড. হান্টসের অফিস থেকে অ্যাকোয়েস্টিক কপলারটা নিয়ে গেছ। এটা অপরাধ।'

অথচ আমরা ভেবেছিলাম, কেউ যখন যন্ত্রটা ব্যবহার করছে না, এটা বাড়িতে নিয়ে গেলে ক্ষতি কী! মজার ব্যাপার হলো, চিঠির শেষে অধ্যাপক লিখেছেন, 'এমনকি তোমরা কপলারের জায়গায় একটা চিরকুটও রেখে যাওনি! এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' এই কথা দিয়ে তিনি কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছেন।

সেই সময়ে আমি যদি পুরোনো কম্পিউটারে বুঁদ হয়ে না থাকতাম, যদি আমার আগ্রহের বিষয়টা সম্পর্কে যতটা সম্ভব জ্ঞান আহরণ না করতাম, হয়তো মাইক্রোসফটের জন্ম হতো না। এখানে শেখার বিষয় হলো, কখনো কখনো তোমার সামনে কোনো পথ থাকবে না। কখনো কখনো ভুল পথ তোমাকে ঠিক পথের দিকে ঠেলে দেবে। যদি শেখার নিরন্তর চেষ্টা থাকে, তাহলে তুমি নিশ্চয় সাফল্যের পথেই হাঁটবে।

কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি নিয়ে কথা বলতে গেলে কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব সম্পর্কেও তোমাদের ভাবতে হবে। আমার কাছে মনে হয়, আমরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহলে কোনো ঝুঁকিই পাত্তা পাবে না। উড়োজাহাজ যখন আবিষ্কৃত হলো, রেল শিল্পের ওপর সেটা প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এটি মানবজাতির উন্নয়নের নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে। যখন আমরা আরও বুদ্ধিদীপ্ত কম্পিউটারের সহায়তা পাব, এটা মানুষের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

তোমরা যারা তরুণ কম্পিউটার প্রকৌশলী, তোমাদের আমার হিংসা হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তোমরা তোমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছ। মুহূর্তেই তোমরা জটিল প্রোগ্রামিংয়ের কাজগুলো করে ফেলতে পারছ। হাতের কাছেই আছে সব সুবিধা। আমাদের সময়ে এটা কল্পনাও করা যেত না। ১৯৭২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা যে সিডিসি ৬৪০০ কম্পিউটার ব্যবহার করত, তার চেয়ে হাজার গুণ দ্রুত গতির যন্ত্র এখন তোমাদের পকেটে আছে। যে প্রোগ্রাম তোমরা ব্যবহার করছ, তার ক্ষমতা তোমার কল্পনার চেয়েও বেশি। অথচ আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করেছি, তার 'মেমোরি' আর 'স্টোরেজ' ছিল খুবই স্বল্প।

তোমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কী হতে পারে, সেটা নিয়ে কিছু কথা বলি। বর্তমানে মানুষের কারণে জলবায়ুর কী কী পরিবর্তন হচ্ছে, আর ভবিষ্যতে কী কী পরিবর্তন আসছে, তা নির্ণয়ে তোমরা কাজ করতে পারো। কার্বন নিঃসরণ ও দুর্ঘটনা রোধ করতে উন্নত যানবাহনের নকশা করতে পারো। এমন কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারো, যেটা সঠিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকদের সাহায্য করবে। জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত কোনো মডেলও তৈরি করতে পারো, যা কিনা কোষ বিশ্লেষণ করে সুস্থ শরীর ও রোগাক্রান্ত শরীরের মধ্যে পার্থক্য দ্রুতই শনাক্ত করতে পারবে। রোবটিকস নিয়ে কাজ করো, যেন কর্মক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে সহায়তা করতে আমরা রোবট ব্যবহার করতে পারি।

আমরা সত্যিই কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক স্বর্ণালি সময়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। তোমরাই এই সময়টার নেতৃত্ব দেবে। সাহসী হও, সত্যের পথে থাকো। বিশ্বাস আর দুঃসাহসই আমাদের মাইক্রোসফট গড়তে সাহায্য করেছিল। মনে রেখো, স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে তুমি অতিরিক্ত বিনিয়োগ করছ, এই অভিযোগে যদি কেউ তোমার দিকে আঙুল তোলে, তার মানে তুমি ঠিক পথেই আছো।

প্রথম আলো ১১ নভেম্বর ২০১৮

# সম্ভাবনার পাশাপাশি বিপদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ডিজিটালাইজেশন

## জ্যঁ তিরোল

অ্যাপল, অ্যামাজন, ফেসবুক আর গুগলের মতো শীর্ষ প্রযুক্তি জায়ান্টগুলো বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলাকে স্পষ্টভাবেই ব্যাহত করছে। নিজেদের বন্য স্বপ্নগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে তারা সফল হয়েছে (যদিও এক্ষেত্রে আমি খানিকটা সন্দিহান)। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে এসব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা বোধকরি এতকিছু আশা করেননি। যেমন গণতান্ত্রিক নির্বাচন ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সর্বনাশা প্রভাব বিস্তারের ঘটনাগুলো যদি বিবেচনা করা হয়।

আমাদের সমাজে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ও সম্ভাবনাগুলো নির্ণয় করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলো জনমনে একইসঙ্গে আশা ও ভীতির সঞ্চার করেছে, আর তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ছোট একটি দল আধুনিক অর্থনীতির প্রবেশদ্বারে রীতিমতো পাহারা বসিয়েছে।

বর্তমানের তথ্যপ্রযুক্তির বাজারগুলো ভীষণ কেন্দ্রীভূত, যা নিয়ে বিতর্কের সুযোগ নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানই গোটা বাজারে কর্তৃত্ব করছে। এটি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে, ব্যবহারকারীরা হাতে গোনা দুয়েকটি প্লাটফর্মে আসক্ত এবং তাদের সেবার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা ন্যায্যভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশের যথেষ্ট বৈধ ভিত্তি রয়েছে।

### ত্রুটিপূর্ণ নেটওয়ার্ক

প্রযুক্তি বাজারগুলো কেন্দ্রীভূত হওয়ার পেছনে কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, নেটওয়ার্ক এক্সটার্নালিটি; এর মানে যার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে আগ্রহী, তিনি যে নেটওয়ার্কে বিদ্যমান, শুরুতে আমাদেরও একই নেটওয়ার্কের আওতায় আসতে হয়। এটি ফেসবুকের ব্যবসার মডেল। এ মডেল ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক সফলতা নিয়ে সন্দেহের সুযোগ নেই, কিন্তু কোম্পানির স্বার্থগুলো উদ্বেগের। অন্য কোনো প্লাটফর্ম ব্যবহারের আগ্রহ থাকলেও আপনার বন্ধুরা যদি ফেসবুক ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাকেও প্লাটফর্মটি ব্যবহার করতে হবে।

টেলিফোন যখন আবিষ্কার হয়েছিল, তখন একটি ফোন সিস্টেম ঘিরে প্রতিটি দেশে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যার পরিণতি দাঁড়ায় একচেটিয়া আধিপত্য। পুনশ্চ, এটিও অস্বাভাবিক কোনো বিষয় ছিল না। ব্যবহারকারী সহজেই ফোনে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা একক একটি প্লাটফর্মে সমবেত হন। আশি ও নব্বইয়ের দশকে টেলিফোন শিল্প ঘিরে যখন পুনরায় প্রতিযোগিতা চালু হয়, তখন সেক্ষেত্রে আন্তঃসংযোগের প্রয়োজন পড়ে, যার ফলে একজন ব্যবহারকারী অন্য নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারে। বিধিবিধান ছাড়া বর্তমান অপারেটররা ক্ষুদ্র ও নতুন অপারেটরদের প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। যদিও বিভিন্ন ফোন কোম্পানির চেয়ে সোস্যাল নেটওয়ার্ককে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান সহজ ও সাশ্রয়ী, যা এখনো সমন্বয়ের দাবি রাখে।

নেটওয়ার্ক এক্সটার্নালিটিগুলো সরাসরি হতে পারে, যেমন ফেসবুকের ক্ষেত্রে। আবার পরোক্ষও হতে পারে, যেমন বিভিন্ন প্লাটফর্ম নানা ধরনের অ্যাপস ও গেম তৈরি করে। যে প্লাটফর্মে ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি, সেখানে অ্যাপসের সংখ্যাও বেশি। আপনি যদি উল্টো করে বলেন, সেটিও ঠিক। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ভালো ক্রাউডসোর্স পূর্বাভাসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও সেবার মান নির্ধারণ করতে পারে। যেভাবে গুগল সার্চ ইঞ্জিন ও নেভিগেশন অ্যাপ ওয়েজ কাজ করে। অপ্রচলিত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে নেই, তাই প্রতিযোগিতামূলক সার্চ ইঞ্জিনগুলো সাধারণ অনুসন্ধানের জন্য গুগলের ফলাফলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। উপরন্তু, নতুন সেবার জন্য তথ্যের প্রয়োজন হয়, বিদ্যমান সেবার ব্যবহারকারীরাই তা সরবরাহ করে।

### সমস্যার মাত্রা

প্রযুক্তিবাজারে উচ্চপর্যায়ের কেন্দ্রীভূতকরণে দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে প্রভাবশালী সংস্থাগুলো 'ইকোনমিকস অব স্কেল' থেকে উপকৃত হচ্ছে। কিছু সেবায় বড় ধরনের প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে, এটি যদি সার্চ ইঞ্জিন বিষয়ক সেবা প্রতিষ্ঠান হয়, সেক্ষেত্রে

প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর দুই হাজার হোক কিংবা দুই ট্রিলিয়ন–উল্লিখিত সংখ্যক অনুসন্ধানের অনুরোধ আকর্ষণ করতে পারবে কিনা, তা বিবেচনায় নিয়ে সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। পার্থক্যটি ঘটবে ব্যবহারকারীদের তথ্যের মূল্যমানে। দুই ট্রিলিয়ন সার্চ রিকোয়েস্টের বিপরীতে একটি কোম্পানি বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে দ্রুত চড়া অর্থ দাবি করতে পারে।

নেটওয়ার্ক শক্তি ও ইকোনমিকস অব স্কেলের মাধ্যমে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে 'স্বভাবগত একচেটিয়া আধিপত্য' বিস্তার করে। অনলাইন ইকোনমি অনেকটা 'যিনি জিতবে, তিনি সিকেন্দার' যুক্তি অনুসরণ করে। একসময় ইন্টারনেট ব্রাউজার মার্কেটে কর্তৃত্ব করেছে নেটস্কেপ নেভিগেটর, পরবর্তীতে মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, আর এখন চালকের আসনে রয়েছে গুগল ক্রোম।

কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। ইকোনমিকস অব স্কেল ও নেটওয়ার্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ডিজিটাল গান ও সিনেমার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্লাটফর্ম রয়েছে যেমন অ্যামাজন প্রাইম, অ্যাপলের আইটিউন, ডিজার, স্পোটিফাই, প্যানডোরা ও নেটফ্লিক্স। তবে এ সেবাগুলো তাদের ব্যবহারকারীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা দ্বারা আলাদা।

## ব্যবসায়িক মডেলের নীতি পরিবর্তন

প্রচলিত প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার পেছনের যুক্তিগুলো এখন আর বৈধ নয়, বিশ্বজুড়ে নীতিনির্ধারক আর নিয়ন্ত্রকরাও এখন এ বিষয়টির মুখোমুখি হচ্ছে। একদিকে গুগল ও ফেসবুকের মতো প্লাটফর্মগুলো নামমাত্র মূল্য বা বিনামূল্যে সেবা সরবরাহ করছে, আবার অন্যভাবে চড়া মূল্য নির্ধারণ করছে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি প্রতিযোগীদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করছে। প্রচলিত বাজার ঘিরে এ ধরনের চর্চাগুলোকে পুরস্কৃত করা হলেও সার্বিক অর্থে এটি ক্ষুদ্র কিংবা তুলনামূলক ছোট প্রতিযোগীদের দুর্বল কিংবা ধ্বংস করে। অন্যদিকে চড়া মূল্য ধার্যের মাধ্যমে বাজারে একচেটিয়া ক্ষমতার প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এদিকে ছোট পরিসরের কিছু ডিজিটাল ফার্ম ও স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান সামঞ্জস্যহীন মূল্য ধার্যের চর্চায় নিয়োজিত। যেমন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থায়ন করা বিনামূল্যের অনলাইন পত্রিকা। ডিজিটাল অর্থনীতিতে দ্বিপক্ষীয় বাজার ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের যদি এ ধরনের অপ্রচলিত ব্যবসায়িক মডেল সম্পর্কে ধারণা না থাকে, তাহলে সে ভুলভাবে মূল্য কমানো বা অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দিতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকদের প্রতিযোগিতামূলক কৌশলের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতির যান্ত্রিক প্রয়োগের বিষয়টি এড়িয়ে চলতে হবে। নীতিগুলো মাল্টি-সাইডেড প্লাটফর্মের অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়।

দ্বিপক্ষীয় বাজারে প্রতিযোগিতার নীতি গ্রহণের জন্য নতুন নির্দেশিকা প্রয়োজন। স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণের চেয়ে বাজারের উভয় দিক একত্রে বিবেচনায় আনতে হবে, তাছাড়া নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষেরও এখানে অনেক কিছু করার আছে। এক্ষেত্রে যত্নসহকারে কাজ করার পাশাপাশি একটি নতুন বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রয়োজন।

## নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পুনর্বিবেচনা

বিস্তারিতভাবে ডিজিটাল ইকোনমি নিয়ন্ত্রণের চারটি প্রচ্ছন্ন ক্ষেত্র রয়েছে–প্রতিযোগিতা, শ্রম আইন, গোপনীয়তা ও কর আরোপণ। কোনো কোম্পানি যখন কর্তৃত্বশীল অবস্থানে চলে যায়, তখন উচ্চমূল্য ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের অভাবজনিত বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাজারে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে, অন্যথায় অর্থনীতির ভাষায়, বাজার প্রতিযোগিতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি জোরালো প্রতিযোগিতা বজায় রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ন্যূনতম গতিশীল প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করতে হবে; একটি কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানকে কোনো একটি স্টার্টআপ কোম্পানি দিয়ে স্থাপন করার ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রযুক্তি অথবা বাণিজ্যিক কৌশল গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অনলাইন মার্কেটে প্রবেশের শুরুতে নতুন কোম্পানিগুলো প্রায়ই বিশেষ ধরনের পণ্য নিয়ে আসতে মনোযোগী থাকে; তারা যদি সফল হয়, তবে পরবর্তীতে আরো পণ্য ও পরিষেবার প্রস্তাব নিয়ে আসে। প্রথমে যেমন গুগল শুধু সার্চ ইঞ্জিন সেবা নিয়ে এসেছিল, অ্যামাজনের শুরুটা ছিল বই বিক্রির মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারের প্রথম সারিতে প্রবেশ করতে পারছে কিনা। নতুনদের মধ্যে যদি কেউ ন্যূনতম একটি মৌলিক পণ্য নিয়ে হাজির হতে পারে, তবে তা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির তুলনায় ভালো হবে। এমনকি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নতুনদের সামান্যতম সাফল্যকেও রুখে দেয়ার বিষয়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিতে চাইবে। কোম্পানিগুলোর স্বল্পমেয়াদি মুনাফা অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে বলে তারা এটি করবে না, বরং প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে যে একচেটিয়া প্রভাব বজায় রেখেছে, তাতে যেন কোনো ধরনের আঁচ না লাগে তা নিশ্চিত করতে চাইবে কিংবা প্রভাবশালী অন্যান্য কোম্পানির প্রতিযোগীদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতে নতুনদের থামাতে চাইবে।

মূলত এ কারণেই 'টাই-ইন-সেল' একটি ক্ষতিকর বিরোধী প্রতিযোগিতামূলক অনুশীলন। যেখানে কোনো একটি পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অন্য ধরনের পণ্যও কিনতে হয়, একচেটিয়া কোম্পানিগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন অনুপ্রবেশকারীদের বাজারে প্রবেশাধিকার অগ্রাহ্য করতে পারে। এমনকি এখনো এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বজনীন নীতি তৈরি করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রভাবশালী কোম্পানির টাই-ইন-সেল নীতির অনুসরণের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে অথবা তাদের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিক ভিত্তি অনুযায়ী বিপরীত চাল (যেমন স্বত্ব রেয়াত) প্রয়োগ করতে পারে।

পরিশেষে বলব, ডিজিটাল সেক্টরে উৎপাদনশীল প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে এ প্রশ্নগুলো উত্থাপন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকদের কঠোর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

[চলবে]

ভাষান্তর : রুহিনা ফেরদৌস

লেখক: ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ।

bonikbarta.net

# ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের কথা তুললে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঢাকার 'অপরাজেয় বাংলা'র ছবি। তারপর বহু ভাস্কর্য হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় নিয়ে। নগরীর মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যগুলো দেখলেই একাত্তরের ৯ মাসের ঘটনার চাক্ষুস দেখা মেলে। এসব ভাস্কর্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালির প্রতিবাদ, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, গতি-উদ্যমের প্রতীক, বীরত্ব, গণহত্যাসহ অসংখ্য চিত্র। যা বর্তমান প্রজন্মকে যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই একাত্তরে। বেশিরভাগ ভাস্কর্যই হয়েছে কেবল মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ ও বীরত্ব নিয়ে। তবে হয়নি কেবল বিকৃত রাজাকার আর আলবদর নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'ঘৃণা স্তম্ভ' নামে একটি স্তম্ভ তৈরি করে রাজাকার-আলবদরের ঘৃণা জানালেও তার স্থায়ী রূপ পায়নি।

## সোপার্জিত স্বাধীনতা

ব্যস্ত নগরী ঢাকায় ভাস্কর শামীম শিকদারের একাধিক ভাস্কর্য থাকলেও সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেছেন সোপার্জিত স্বাধীনতা নির্মাণের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সড়কদ্বীপে নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৮ সালের ২৫শে মার্চ এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

১৭ ফুট উঁচু ভাস্কর্য। সাদা মার্বেল এবং মার্বেল ডাস্ট এবং সাদা সিমেন্টসে গড়া। চৌকো বেদির উপর নির্মিত ভাস্কর্যটির একদম উপরে বামে আছে মুক্তিযোদ্ধা কৃষক আর ডানে রয়েছে অস্ত্র হাতে দুই মুক্তি যোদ্ধা। এ ভাস্কর্যটি মাটি থেকে ১৮ ফুট উঁচু। আজো সব অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্রে আছে ভাস্কর্যটি। এর নির্মাতা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।

১৯৫২ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার উপর আলোকপাত করে গড়ে তোলা হয়েছে এই ভাস্কর্যটি। প্যানেলের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে বিভিন্ন স্লোগান। স্বাধীন দেশের পতাকা ওড়ানোর জন্য বাঙালি যে পরিমাণ রক্ত দিয়েছে, নির্যাতন সয় তার প্রায় কটি খণ্ড চিত্র বেদির চারপাশে চিত্রায়িত হয়েছে। বেদির বাম পাশে রয়েছে ছাত্র-জনতার ওপর অত্যাচারের নির্মম চেহারা।

## রেলওয়ের শহিদের স্মরণে

একাত্তরের ৯ মাসে প্রাণ দিয়েছে হাজারো রেল কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের স্মরণে নগরীর কমলাপুর রেলস্টেশনের সামনে স্থাপিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য। উঁচু বেদির ওপর বসানো হয়েছে আস্ত একটি রেলের ইঞ্জিন। তার ওপর মুক্তিযোদ্ধার হাত বেয়োনেট সহ রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে। পাশেই উড়ছে বিজয় নিশান। রেল ইঞ্জিনের নিচে বেদির চারপাশে সিমেন্টে তৈরি ম্যুরালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বায়ান্ন থেকে একাত্তরের বিজয়ের ক্ষণটি পর্যন্ত।

## একাত্তর স্মরণে

মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য ভাস্কর্য এটি। বাংলা একাডেমি ভবনের প্রধান ফটকের ডান পাশের দেয়ালে স্থাপিত রয়েছে ভাস্কর্যটি। ব্রোঞ্জ কাস্টিংয়ের এ ভাস্কর্যে এক গ্রামীণ যোদ্ধা অস্ত্র হাতে এগিয়ে যাচ্ছে। তার চারপাশে আছে ব্রোঞ্জ কাস্টিংয়ে তৈরি ম্যুরাল। সেখানে তুলে ধরা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কালের কটি খণ্ড চিত্র।

## শিখা চিরন্তন

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু স্মৃতি বিজড়িত স্থান। একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু এখানে জাতির মুক্তির সনদটি ঘোষণা করেছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর এখানেই পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। তাই এ উদ্যানটিতে 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' নির্মাণের পরিকল্পনা হয়। এই অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ এ শিখা চিরন্তন উদ্বোধন করেন বিশ্বের চার রাষ্ট্রপ্রধান নেলসন

ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত, সুলেমান ডেমিরেল ও বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

## মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভাস্কর্য

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানী। সে কথা মাথায় রেখে এ ভাস্কর্য নির্মিত হয় ওসমানী উদ্যানে। পর্যায়ক্রমে ১১টি সেক্টরের জন্যই এমন ভাস্কর্য তৈরি হবে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভাস্কর্যের সাদা দেয়ালের মাঝখানে খচিত বাংলাদেশের মানচিত্র। মানচিত্রে দুই নম্বর সেক্টরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পাশেই কালোর মধ্যে সাদা রঙে লেখা ইংরেজি হরফ 'কে'। দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশারফের নামের প্রথম অক্ষর।

## শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মিত এ স্মৃতিসৌধ। এতে বিশাল প্রাঙ্গণে বেদির ওপর বসানো রয়েছে শ্বেতপাথরের এক ফলক। বেদির চারপাশ দিয়ে নেমে গেছে সিঁড়ি। চারটি দেয়াল ও বেদি সবই লাল ইটে তৈরি। ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে এ বেদি ফুলে ভরে ওঠে। ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর এ স্মৃতিসৌধের ফলক উন্মোচন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

## রাশার '৭১-এর গণহত্যা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যা করা হয় অসংখ্য বাঙালিকে। সেই শহিদদের স্মরণে এ ক্যাম্পাসে নির্মাণ করা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণহত্যা নিয়ে একটি ভাস্কর্য। এটি গড়েছেন ভাস্কর রাশা। ভাস্কর্যটির একাংশের নাম 'মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি' ও অন্য অংশের নাম '৭১-এর গণহত্যা'। পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতা চিত্রই ফুটে উঠেছে এ ভাস্কর্যে।

## রাজারবাগের চির দুর্জয়

একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ করেন রাজারবাগের পুলিশ বাহিনী। সে শহিদদের স্মরণে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নির্মিত হয় 'চির দুর্জয়'। একটি বেদির ওপর দাঁড়ানো পাঁচ যোদ্ধা। আছেন কৃষক, শ্রমিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য। তাদের তিনজন রাইফেল হাতে, একজন ছুড়ছেন গ্রেনেড আর একজন পতাকা হাতে যাচ্ছেন এগিয়ে। ভাস্কর্যটি মৃণাল হকের গড়া।

## ৭১'র স্মৃতিচিহ্ন ভাস্কর্য

১৯৭১ সালে সমগ্র বাংলাদেশে পাকবাহিনী ও তার দোসর রাজাকার আলবদর বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে অকাতরে প্রাণ দেন অগনিত মানুষ। ময়মনসিংহের মানুষ বাদ পড়েনি। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলা শহরের পাড়া টঙ্গীতে ময়লা খানা সংলগ্ন আয়মন নদীর তীরে মুক্তিযুদ্ধকালীন অগনিত মানুষকে হত্যার পর লাশ ফেলে রাখা হয়। দেশ স্বাধীনের দীর্ঘদিন পর বিংশশতাব্দীতে সাবেক গণপরিষদ সদস্য, পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক খোন্দকার আব্দুল মালেক শহীদুল্লার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ময়লা খানার আয়মন নদীতীরে বধ্যভূমিতে স্থাপন করা হয় পৃথক

দুটি ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্য দুটি যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ধবংস হয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসী ভাস্কর্যগুলিকে লাকড়ি শুকাতে এবং গরু ছাগল লালন-পালন করতে ব্যবহার করছে। শুধু এ দুটি ভাস্কর্যই নয় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর্যগুলির একই অবস্থা যা কেবল ১৬ই ডিসেম্বর এলেই মনে পড়ে।

## চেতনা '৭১ ভাস্কর্য

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত চেতনা '৭১ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মারক ভাস্কর্য।

ভাস্কর্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এবং একাডেমিক ভবনগুলোর লাল ইটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভিত্তি বেদিটি ৩টি ধাপ বানানো হয়েছে। এই বেদিটি তৈরি লাল ও কালো সিরামিক ইট দিয়ে। তিনটি ধাপের নিচের ধাপের ব্যাস ১৫ ফুট, মাঝের ধাপ সাড়ে ১৩ ফুট এবং উপরের ধাপটি ১২ ফুট। প্রত্যেকটি ধাপের উচ্চতা ১০ ইঞ্চি। বেদির ধাপ ৩টির উপরে মুল বেদিটি ৪ ফুট উঁচু, তার উপরে রয়েছে ৮ ফুট উচ্চতার মূল ফিগার।

এই ভাস্কর্যটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ভাস্কর্যটিতে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের আদলে অবয়ব তৈরি করা হয়েছে। পোশাক ও আনুষঙ্গিক উপকরণেও রয়েছে বর্তমান সময়ের ছাপ। মডেলে ছাত্রের হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও পরে তুলে ধরার ভঙিমায় দাঁড়িয়ে এবং ছাত্রীর হাতে রয়েছে বই, যা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতীক নির্দেশ করে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় খোলা আকাশের নিচে ভাস্কর্যটি নির্ভীক প্রহরীর মতো স্বাধীনতা এবং সার্বোভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুউচ্চ ভাস্কর্যটি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আদলে তৈরি করা হয়েছে। ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় সোয়া কোটি টাকা। মাটি থেকে ভাস্কর্যটির উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফিট। [চলবে]

মনির হোসেন মনি
sonelablog.com

# তামাক বিরোধী আন্দোলনে যুব সমাজের ভূমি কা

ধূমপান আধুনিক বিশ্বের অন্যতম অভিশাপ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী ধূমপানের কারণে প্রতিবছর ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় এই তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণে সৃষ্ট রোগের কারণে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী এই তামাক মহামারী ২৫ কোটি শিশু কিশোর-কিশোরীদের অকাল মৃত্যুর কারণ হবে। ধারণা করা হচ্ছে ২০২০ সালের মধ্যে তামাক মানুষের মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত হবে। ফলে বিশ্বব্যাপী ধূমপান জনিত মৃত্যুর হার অন্যান্য মারাত্মক অসুখ জনিত মৃত্যু হারকেও ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী আগামী দুই দশকে বিশ্বব্যাপী ধূমপানের ফলে মৃত্যুর হার বেড়ে তিনগুণ হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বর্তমান গবেষণা অনুযায়ী তামাকজনিত বা ধূমপানের কারণে রোগের সংখ্যা সর্বমোট ২৫টি। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার ও শ্বাসকষ্ট জনিত শিশু রোগ।

এই ধূমপানের অন্যতম শিকার হচ্ছে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম অর্থাৎ যুবসমাজ। বাংলাদেশে ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৩২ লক্ষ। এদের মধ্যে প্রায় ২ কোটি বেকার। তারা অনেকেই অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, হতাশা ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় জর্জরিত। এই সব সমস্যার সাথে 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার' মতো সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যুবদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে 'ধূমপান তথা বিষপানের বদ অভ্যাস'।

'ধূমপানে বিষপান' শ্লোগানের প্রচার সত্ত্বেও অমৃতের মতোই তামাকপ্রিয়তা বাংলাদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রামীণ, ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র, ছাত্র-অছাত্র, রিক্সাওয়ালা, দিন-মজুর, শ্রমিক, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, সবার মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট আসক্ত হয়েছে কৈশোর বা যৌবনে। কবির ভাষায় 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার' বাস্তবে দেখা যায় 'এখন যৌবন যার ধূমপানের সময় তার'। সাহিত্যিক মিন্নাত আলীর মতে 'ছাত্রদের প্রিয় খাদ্য সিগারেট'। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে বীরদর্পে ধোঁয়া উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় ছাত্রসমাজ। আজকাল বাসে, লঞ্চে, ট্রেনে, সিনেমায়, বাজারে রেলস্টেশনে ধূমপায়ীদের দৌরাত্মে অধূমপায়ীদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। অধূমপায়ীদের অধিকার খর্ব করে তাদের স্বাস্থ্যগত সর্বনাশ করার ব্যাপারে মোটেই বিচলিত নন। বরং প্রতিবাদ করলে তারা বিরক্তি বোধ করেন।

যে প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বা ঠুনঠুনে বুড়োটি খুক খুক করে কাশির সাথে হুক্কা বা সিগারেটে সুখটান দিচ্ছে, হাঁপরের মতো যার পাঁজরে শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠা-নামা করছে তার অতীত জীবনের খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যায়, তিনি জীবনে প্রথম কখন কোথায় কি কারণে সিগারেট ধরেছিলেন? তাহলেই বেরিয়ে যাবে তার তামাকাসক্ত হওয়ার মূল হোতা কে বা কারা? অধূমপায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, তারা সকলেই কৈশোরে বা তারুণ্যে বন্ধুদের কাছ থেকে ধূমপানের প্রথমপাঠ নিয়েছেন। তার পিছনে ছিল কৌতূহল, পুরুষ-পুরুষ ভাব দেখানোর প্রবণতা, উন্মাদনা, প্রিয় নায়কের স্টাইল অনুসরণ। আবার কেউ কেউ জীবনে ব্যর্থতা আর হতাশার হাত থেকে মুক্তির জন্য নিজেকে তামাকের ধুম্রজালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে ধূমপানের সুখটানের সাথে নাকি দুরহ সমস্যার সমাধান, কবিতা, শিল্পচর্চা ইত্যাদি সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। এসব উদ্ভট, বিভ্রান্তিকর অযৌক্তিক কারণের দোহাই সিগারেট খোরগণ নিজেদের বদঅভ্যাসের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকেন। অধিকাংশ ধূমপায়ী ব্যক্তিই প্রথমে কৌতূহলবশত আরম্ভ করে পরে প্রচণ্ড রকমের তামাকাসক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি তামাক বা সিগারেটের দাস হয়ে যান। তখন তিনি আর সিগারেট খান না সিগারেটই তাকে খেতে শুরু করে। তামাক সিগারেটের মধ্যে আছে সর্বনাশা নিকোটিন যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

অথচ ভেবে দেখুন, যে সময় এই উঠতি তরুণটি অকালপক্ক ধূমপায়ী বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অনেক ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সিগারেট ধরাতে বাধ্য হয় সে সময় তার পাশে যদি তামাক বিরোধী যুবকদের কোনো

সংগঠন থাকত যারা এই যুবকটিকে পূর্বেই ধূমপানের মারাত্মক ছোবল ও ভয়াবহ পরিনতি সম্পর্কে আরো সজাগ ও সচেতন করত তাহলে অবশ্যই এই তরুণটি সারাজীবনের ধ্বংসকারী নেশার হাত থেকে রক্ষা পেত। সুতরাং তামাক বিরোধী আন্দোলনে নামতে হবে যুবকদের, কারণ তাদেরই একটি অংশ Peer Pressure এ সিগারেট ধরছে। এই নেশার ফলে তাদের ভবিষ্যত জীবন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে যুবসমাজ তামাক বিরোধী আন্দোলনে কি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে?

**এলাকাভিত্তিক শক্তিশালী যুবসংগঠন/ক্লাব/ব্রিগ্রেড গড়ে তোলা**

একটি ব্যক্তি যুবকের আহ্বানে কেউ সাড়া দেবে না। সেজন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী, মাদকবিরোধী সংগঠন গড়ে তোলা যারা প্রতিনিয়ত তামাক বিরোধী আন্দোলনে শরিক হবে। প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায়, তামাক বিরোধী আন্দোলনে নিয়োজিত নিবেদিত প্রাণ যুবকদের একটি সংগঠিত ব্রিগেড তৈরি করা যারা প্রতিনিয়ত তামাক প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকবেন।

**যুব সংগঠনের কর্মসূচি**

- ক্লাবের সদস্যদের অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে। কথায় আছে 'আপনি আচরি ধর্ম, পরের শিক্ষাও'। যিনি নিজে ধূমপায়ী বা তামাক সেবনে অভ্যস্থ তার অপরকে উপদেশ নির্দেশ দেবার আধিকার নেই। তবে হ্যাঁ, তিনি যদি ধূমপান ত্যাগ করে তার ধূমপানের জন্য যে আর্থিক, মানসিক ও দৈহিক ক্ষতি হয়েছে সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে অপরকে ধূমপানে বিরত করতে পারেন তাহলে তা কাজে আসবে।
- প্রত্যেক সদস্য নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শৈশব থেকে ধূমপান বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলবেন। ধূমপানের সর্বরকমের কুফল সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করতে হবে এবং বন্ধুদের প্ররোচনায় যাতে তারা প্ররোচিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।
- সংগঠনের সকল সদস্যদের জন্য তামাক বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য 'যথোপযুক্ত অবহিতকরণ' কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে।
- আত্মউন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কিশোর ও যুবকদের মধ্যে Self esteem বাড়ানো। আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বলে উৎসবে ও বন্ধু বান্ধবের দুষ্ট প্ররোচনার মুখে 'না' বলতে শিখার মতো সাহস সঞ্চয় কোনো অনুষ্ঠানে, সঙ্গীত, নাটক, কনসার্ট, বনভোজনে বন্ধুরা সিগারেটের অফার দিলে তাদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার শক্ত মনোভাব গড়ে তোলা।
- প্রতিমাসে অন্তত একবার এলাকার কিশোর ও যুবদের নিয়ে তামাক বিরোধী আলোচনা সভা করা।
- টেম্পো, বাস, ট্রেনে, লঞ্চে ধূমপানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।
- ক্লাব এলাকার অভিভাবক, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠনের যুবনেতাদের নিয়ে তামাক বিরোধী সমন্বয় কমিটি গঠন।
- স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালের সমানে ছাত্র-ডাক্তার, রিক্সাওয়ালা, পথচারী, বেবীট্যাক্সি চালক অনেককে ধূমপানরত দেখা যায়। এ ব্যাপারে স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষেরও অন্যান্যদের সাথে যুব সংগঠন যোগাযোগ করবে। অধূমপায়ীদের সামনে ধূমপান করলে যে স্বাস্থের প্রচণ্ড ক্ষতি হয় সে ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তোলা।
- এসব এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে আন্দোলন করা এবং স্কুল কলেজে সংঘবদ্ধভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা।
- সংগঠনের মাধ্যমে তামাক বিরোধী রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করে কিশোর যুবদের উৎসাহিত করা।
- ধূমপান বিরোধী গান, নাটক, পোস্টার, র‍্যালী ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে তামাক পানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা।
- যুব সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার যুবদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বিতর্ক, নাটক, ছবি ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করে যুবদের মধ্যে স্থবিরতা ও হতাশার পরিবর্তে তাদের সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে ঘটানো এবং স্বাস্থ্যসম্মত ইতিবাচক জীবন যাত্রায় অভ্যস্থ করা।

এব্যাপারে গণমাধ্যমের ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। 'যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গোল্ডলীফ সিগারেটের আপনাকে দেবে অপর অনন্দ', এসমস্ত স্ববিরোধী প্রচার যুবকদের প্রাণের বিনিময়ে সিগারেটের রমরমা ব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

যদিও প্রবন্ধটির শিরোনামে যুবদের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তবে যুবসংগঠনের উপরোক্ত কার্যক্রমে অভিভাবকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। অভিভাবকের সহায়তা ব্যতীত কর্মসূচি সফল করা কঠিন। যে যুবকটি তামাক বিরোধী আন্দোলনে জড়িত তার পিতা যদি ধূমপায়ী হয় সে কিভাবে বাড়ির কনিষ্ট ভাইটিকে ধূমপানের বিরুদ্ধে সচেতন করবেন।

তামাক বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে হবে যুবদের সাথে গোটা সমাজকে। গণমাধ্যম, সংবাদপত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা ধূমপানের বিরুদ্ধে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থায় সচেষ্ট হতে হবে। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় তামাক বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নিতে হবে। যদিও তামাক মুক্ত বিশ্ব কল্পনা করা অবাস্তব তবুও আমাদের প্রাণপন চেষ্টা চালাতে হবে। এর অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে বিরত করতে হবে। Games Baldon এর মতে 'Not Everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.'

এই হোক আজকের শপথ–
যদিও তামাক সেবীরা চারিদিকে ফেলিতেছে
বিশাক্ত নিশ্বাস
তবুও প্রাণবন্ত তরুণদের অটল বিশ্বাস,
এ বিশ্বকে তামাক মুক্ত করবই
বিনিময়ে ছড়াব ফুলের নির্যাস।

অধ্যাপক ড. রওশন আরা ফিরোজ
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, গভর্নিং বোর্ড, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন।

# হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার পাখি

বাংলাদেশকে বলা হয় পাখির দেশ, গানের দেশ। গাছের ডালে ডালে পাখির কলকাকলিতে সবসময় মাতোয়ারা থাকতো গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি। একসময় পাখির সুমধুর ডাকে বাংলার মানুষের ঘুম ভাঙলেও গ্রাম-বাংলার আনাচে-কানাচে আগের মতো আর পাখির ডাক শোনা যায় না। কালের আবর্তে বাংলার প্রকৃতি থেকে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে পাখি। হাওর-বাঁওড়, বিল শুকিয়ে যাচ্ছে, এছাড়াও শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের জলাভূমি, নদী-খালগুলো। ভরাট হয়ে যাচ্ছে পুকুর। এসব জলাভূমি, হাওর-বাওড় থেকে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে পাখিগুলো। এছাড়াও বড় বড় গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। এসব গাছগুলো পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে থাকে। পাখির আবাসস্থল নির্বিচারে ধ্বংস ও বিভিন্ন ফসলের খেতে কীটনাশক দেয়ার প্রভাবে এসব পাখি আজ বিলুপ্তপ্রায়। বিশেষ করে জাতীয় পাখি দোয়েল, ঘুঘু, বাবুই, মাছরাঙা, টুনটুনি, শালিক, বাওয়াই, ফ্যাসকো, কোকিল, কাঠঠোকরা, ডাহুক, বটর, প্যাঁচা, টেইটেরা, গোমড়া, চিলসহ আরো অনেক পাখি আর সচরাচর দেখা যায় না। শোনা যায় না এসব পাখির মধুর ডাক। উড়তে দেখা যায় না আর মুক্ত নীল আকাশে। বর্তমান সময়ের ছেলেমেয়েরা এসব পাখি হয়তো চোখেই দেখেনি, অনেকেই এসব পাখির নামও জানে না। ফলে তরুণ প্রজন্মের কাছে এসব পাখি হয়ে যাচ্ছে গল্প আর ইতিহাস। এমনকি আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল পাখিকেও ছবি অথবা বই দেখে চিনতে হয় শিশু-কিশোরদের। এ প্রজন্মের অনেক শিশু-কিশোর কখনো দেখেনি মুক্ত আকাশে উড়ন্ত এসব নামকরা পাখি, শোনেনি এসব পাখির ডাকও। বাংলার এসব ঐতিহ্যবাহী পাখিগুলো এভাবেই মানুষের অজান্তেই হারিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

দেশের স্থানীয় পাখি ছাড়াও শীতকালে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বাংলাদেশে শুধুমাত্র আশ্রয়ের জন্য আসে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। যাদের নাম দিয়েছি আমরা অতিথি পাখি। এই পাখিগুলোর কল-কাকলিতে মুখর হয়ে থাকে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এরা সাধারণত আশ্রয় নেয় জলাভূমি, বিল, পুকুর, হাওর, নদী তীরবর্তী জায়গায়। এদের উপস্থিতিতে এসব জায়গার সৌন্দর্য বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায় এদের দেখতে। এই পাখিগুলো সম্পর্কে মানুষের এতো আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে আসছে কিছু অসাধু চক্র। এরা পাখিগুলোকে বিক্রির উদ্দেশে অবৈধভাবে শিকার করে। এছাড়াও বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁয় বিক্রি করে দেয়া হয় অতিথি পাখিগুলোকে। সামান্য লাভের জন্য আমাদের জীববৈচিত্র্যের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে এই বোধোদয় এসব অসাধু মানুষের ভেতর নেই। এদের হাত থেকে পাখিগুলোকে রক্ষার জন্য সব ধরনের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। পাখি শিকার রোধে আইনের প্রয়োগ এবং শাস্তিপ্রদান দৃষ্টান্তমূলক হলে অপরাধীরা পাখি শিকারে নিরুৎসাহিত হবে।

জীববৈচিত্র্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলার আগেই পাখিদের জন্য আমাদের অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে হবে। পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে ধীরে ধীরে একসময় আমাদের সুপরিচিত পাখিগুলো এদেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। যেটা আমাদের কোনোভাবেই কাম্য নয়।

শাহেদ শুভ্র হোসেন
ইত্তেফাক ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
লেখক : শিক্ষার্থী, এমফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# জামদানির জাদু

জামদানি এক অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম। বাংলাদেশের এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। প্রাচীন বাংলার আদি হস্তচালিত তাঁতশিল্প পরম্পরার সঙ্গে এর রয়েছে বিশেষ যোগসূত্র। অসাধারণ নকশায় সমৃদ্ধ জামদানি বস্তুত মসলিনেরই একটি প্রকার। ঔপনিবেশিক যুগের বিলাতি বস্ত্রের অনুপ্রবেশসহ সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে এ বয়নশিল্প। একসময় দেশি-বিদেশি পৃষ্ঠপোষকদের জন্য মিহিন সুতোয় যে ২৮ ধরনের সূক্ষ্ম মসলিন বোনা হতো, এর মধ্যে কেবল এই একটিই টিকে আছে। জটিল প্যাটার্নে শৈল্পিকভাবে বিন্যস্ত বস্ত্রের অন্যতম জামদানি সৃজনসৌকর্যের শিখরে পৌঁছে মোগল শাসনামলেই; কারণ সে সময়ে নতুন প্যাটার্নের সঙ্গে পারসিক মোটিফের সংযোজনে জামদানি হয়ে ওঠে অনিন্দ্যসুন্দর। উল্লেখ্য, জামদানি শব্দটির উৎস ফার্সি। জাম অর্থ ফুল আর দানি অর্থ আধার। অর্থাৎ পুষ্পাধার বা ফুলদানি।

হাতে বোনা এ বিস্ময় বস্ত্রের রয়েছে দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাস, যা আমাদের কল্পনার সীমাকেও অতিক্রম করে। বাংলা আর পুণ্ড্রে এ বস্ত্র তৈরির উল্লেখ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মেলে কৌটিল্যের বিবরণীতে। সেই সুতিবস্ত্র–যা আজো আমাদের কাছে বিস্ময়–তৈরি হয়েছে বিশেষ টানা আর ভরনার বয়নকৌশলে; আর নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য সমান্তরালে ভরনা বরাবর ব্যবহার করা হয় আলাদা সুচ।

স্পর্শকাতর এ শিল্পের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারাটাই হলো আজকের মূল চ্যালেঞ্জ। পূর্বসূরিদের কাছ থেকে বয়ননৈপুণ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিল্পীরা কতটা আয়ত্ত করতে পারছেন, তার ওপরই নির্ভর করছে এ শিল্পপরম্পরার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা। বিশ শতকের সূচনায় বিভিন্ন ধরনের মিলের শাড়ির সহজলভ্যতায় জামদানি শিল্পের ক্রমপতন পরিলক্ষিত হয়। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বয়নশিল্পীরা তাদের পেশা পরিবর্তন করছেন। বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহার আর সহজ নকশার প্রতি আকর্ষণের ফলে অবস্থার আরো অবনতির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ইউনেস্কো ২০১৩ সালে বাংলাদেশের জামদানিকে ইনট্যাজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির প্রতিনিধি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। কুটির শিল্পের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ফলে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এগিয়ে এসেছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি নিয়ে, যা জামদানি শাড়ির ক্রমবিলুপ্তি ঠেকাতে সহায়ক হবে।

জামদানির ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য নানাভাবে অবদান রাখা যেতেই পারে। তবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের আগে দুটো নির্দিষ্ট বিষয়ে জরুরি দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। একটি হলো জামদানি উৎপাদনের অর্থনীতি এবং অন্যটি হলো ঐতিহ্যগতভাবে পরম্পরার শিক্ষা প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা।

জামদানি বয়ন কেবল শিল্প দক্ষতায় নয়, ক্লেশসাধ্য আর সময়সাপেক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়াও। একে টেকসই করতে অতএব প্রয়োজন যথাযথ বিপণন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক বয়নশিল্পীদের এ পেশায় থাকতে উৎসাহিত করবে বটে, তবে তা ক্রমসংকুচিত বাজারের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

বাজার বিস্তারে এর পরই আসে আন্তঃপ্রজন্ম দক্ষতা বিনিময়ের বিষয়। এ প্রসঙ্গে উপেক্ষার জো নেই যে, জামদানিকে তার হৃতগৌরব কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন উন্নতি সাধনের আর সেটা বিশেষত নকশার ক্ষেত্রে। নতুন এবং সহজ বয়নযোগ্য মোটিফ এ শিল্পের পুনরুজ্জীবনে অনুঘটক হতে পারে।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

bonikbarta.net ৩ আগস্ট ২০১৮

# কম খরচে পড়া যাবে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে

উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য যেসব শিক্ষার্থী দেশের গণ্ডির বাইরে পা রাখতে চান, তারা বরাবরই স্কলারশিপের কথাটি মাথায় রাখেন। আর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য যেসব দেশের খ্যাতি রয়েছে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। যারা দেশের বাইরে গিয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর অর্জনের কথা ভাবছেন, তারা খোঁজ নিতে পারেন সেখানকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে; যেখানে আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়–

**ইউনিভার্সিটি অব মেইন**

আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রদান করা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব মেইন অন্যতম। এ বৃত্তি পেতে হলে শুরুতে শিক্ষার্থীদের স্নাতক ডিগ্রি কোর্সের জন্য আবেদন করতে হবে। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বৃত্তি নীতি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, আপনি যদি নির্ধারিত সময়সীমার পরে আবেদনপত্র জমা দেন, তাহলেও আপনার প্রাপ্য অনুযায়ী তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**শিকাগো স্টেট ইউনিভার্সিটি**

বিশ্বের বিভিন্ন অংশের শিক্ষার্থীদের বিদ্যাপীঠ এ বিশ্ববিদ্যালয়। আপনার কোর্স সম্পন্ন করার জন্য শিকাগো স্টেট ইউনিভার্সিটির বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার বিভিন্ন উৎস রয়েছে। তবে যেসব শিক্ষার্থীর আর্থিক সমস্যা রয়েছে, তাদের অগ্রাধিকারে রাখা হয়।

**অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি**

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা নিউ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ প্রোগ্রামের সুবিধা গ্রহণ করেন। অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে প্রতিভাধর শিক্ষার্থীরা ৩ হাজার থেকে ৮ হাজার ডলার পরিমাণ বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

**ইস্ট টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি**

ইস্ট টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মোট টিউশন ফি ও রক্ষণাবেক্ষণ ফির ৫০ শতাংশ বৃত্তি দিয়ে থাকে, যা কিনা শিক্ষার্থীরা এ রাষ্ট্রের ভেতর ও বাইরের যেকোনো ক্যাম্পাসেই ব্যবহার করতে পারেন। স্নাতক সম্পন্ন করবেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য এ বৃত্তি অষ্টম সেমিস্টার পর্যন্ত ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য পঞ্চম সেমিস্টার পর্যন্ত বরাদ্দ।

**ইউনিভার্সিটি অব হাউসটন**

দেশের বাইরে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটু কম খরচে পড়ার বিষয়টা স্বস্তি দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সাশ্রয়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি একটি। এছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা করে এ বিশ্ববিদ্যালয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন।

**ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি সাউথইস্ট**

যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ও বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এ বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, অনুদান ও আর্থিক সহায়তা করে। তবে এসব বৃত্তির পরিমাণ নির্ধারণ হয় শর্তসাপেক্ষে।

# প্রশিক্ষণ পাবে এক লাখ বেকার

সরকারের সেইপ প্রকল্পের আওতায় এক লাখ বেকারকে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) বিষয়ে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (সেইপ) আওতায় বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিংয়ের (বিপিও) পাঁচ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)। এতে মোট এক লাখ বেকার প্রশিক্ষণ পাবে। এরই মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ হাজার ৭৮৪ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১ হাজার জন প্রশিক্ষণ পাবেন। এ প্রকল্প চলমান থাকবে ২০৩০ পর্যন্ত। ঢাকার ১৭টি, চট্টগ্রাম ও যশোরের একটি করে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

**কেন এই প্রশিক্ষণ**

সেইপ প্রকল্পের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিংয়ের (বাক্য) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী মো. মাহতাবুল হক বলেন, 'বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং খাতে দেশে দক্ষ জনবল তৈরিই মূল লক্ষ্য। আউটসোর্সিং খাতের বড় একটা বাজার রয়েছে। মূলত সেটিকে লক্ষ্য রেখে দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে এ উদ্যোগ। এ খাতের একজন দক্ষ কর্মী শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও কাজের সুযোগ পাবে।'

**বিষয়, মেয়াদ ও যোগ্যতা**

দ্বিতীয় পর্যায়ে আড়াই মাস মেয়াদি প্রফেশনাল কাস্টমার সার্ভিস কোর্সটিতে প্রশিক্ষণ পাবে ৮ হাজার ২০০ জন। প্রফেশনাল ব্যাক অফিস সার্ভিস কোর্সের মেয়াদও আড়াই মাস। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ১ হাজার ৭০০ জন। দুই মাস মেয়াদি প্রফেশনাল ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ৪০০ জন। তিন মাস মেয়াদি ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ৩০০ জন। আড়াই মাস মেয়াদি মেডিক্যাল স্কাবিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ৪০০ জন। সব বিষয়ে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে ন্যূনতম স্নাতক বা চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা। বয়সসীমা ১৮ থেকে ৪৫ বছর।

**আবেদন যেভাবে**

আবেদন ফরম পাওয়া যাবে বাক্যর ওয়েবসাইটে (www.bacco.org.bd)। বাক্য মনোনীত ১৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা জানা যাবে ওয়েবসাইটে। সরাসরি অফিসে গিয়েও জানা যাবে দরকারি তথ্য। মনোনীত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা বাক্যর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আবেদন ফরম পূরণ করে পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ছবি, চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপিসহ জমা দিতে হবে।

**প্রার্থী নির্বাচন যেভাবে**

তিন মাস পর পর ভর্তি নেওয়া হয়। অফিস চলাকালে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে হাতে হাতে, ডাকযোগে বা ই-মেইল করে আবেদনপত্র পাঠানো যাবে। খামের ওপর বিষয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদন যাচাই-বাছাই করে ডাকা হবে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। মো. মাহতাবুল হক জানান, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বাছাই করা হবে। তবে প্রতিষ্ঠানভেদে নেওয়া হতে পারে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা।

সাক্ষাৎকারে শিক্ষাগত যোগ্যতা, কম্পিউটার জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, আচার-ব্যবহার, কেন প্রশিক্ষণ নিতে চায় জানতে চাওয়া হতে পারে। দেখা হতে পারে আউটসোর্সিং কাজের প্রতি আগ্রহ। অগ্রাধিকার পাবে বেকার, আদিবাসী, নারী, প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। সেপ প্রজেক্টের অন্য কোনো প্রশিক্ষণে ভর্তি হলে বা আগে প্রশিক্ষণ নিলে আবেদন করা যাবে না।

**প্রশিক্ষণের ধরন**

বিপিও খাতের দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন। থিউরিক্যাল এবং প্রাকটিক্যাল এই দুই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সপ্তাহে পাঁচ দিন ক্লাস হবে। সকাল, দুপুর ও বিকেল-তিন শিফটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতি ব্যাচে ভর্তির সুযোগ পাবে ২৫ জন।

**মিলবে ভাতা ও চাকরি**

কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের জন্য নেওয়া হবে পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মিলবে সনদ। ৮০ শতাংশ উপস্থিতি থাকলে দৈনিক ১০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ নেওয়া ৬০ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীর চাকরির ব্যবস্থা করবে আয়োজকরা। তবে সবার চাকরি পাওয়ার বিষয়ে সহায়তা করে কর্তৃপক্ষ।

**খোঁজ জানবেন যেভাবে**

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাক্যর ওয়েবসাইটে এবং মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ভর্তি তথ্য পাওয়া যাবে। বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বাক্যর ওয়েবসাইটে (www.bacco.org.bd)। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য), অ্যাপার্টমেন্ট বি-২, বাড়ি ৫৯, রোড-২৮, গুলশান-১, ঢাকা ঠিকানায় সরাসরি ও ০৯৬১৪৩৩৪৪৫৫ নম্বরে ফোন করেও জানা যাবে দরকারি তথ্য।

ফরহাদ হোসেন
কালের কণ্ঠ, ১৪ নভেম্বর ২০১৮

# চোখের যত্নে সহজ কিছু উপায় জেনে রাখুন

চোখ অত্যন্ত মূল্যবান অঙ্গ। কিছু খাবার, অনুশীলন ও সতর্কতা অবলম্বন করলে দেহের এ অঙ্গটির যত্ন নেওয়া সহজ হয়। এ লেখায় থাকছে তেমন কিছু উপায়। এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস।

**অভ্যাস**

১. পড়ার সময় ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা অভ্যাস করুন। এ অভ্যাস আপনার চোখকে আর্দ্র রাখবে।

২. প্রচুর পানি পান করুন। দেহে পানির অভাব হলে তা চোখের ক্ষতি করে।

৩. বই পড়ার সময় চোখ থেকে বইয়ের দূরত্ব রাখুন হাতের কনুই পর্যন্ত কিংবা যেখানে আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে দেখতে পান।

৪. শুয়ে কিংবা কাত হয়ে বই পড়লে চোখের সঙ্গে বইয়ের কৌনিক দূরত্ব তৈরি হয়, যা চোখের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই চেয়ারে বসে পড়াই ভালো।

৫. অল্প আলোতে, কাঁপা কাঁপা আলোয় কিংবা চলন্ত গাড়িতে পড়বেন না।

৬. চেখের সঙ্গে বইয়ের কৌনিক দূরত্ব লক্ষ রাখুন। বই যেন চোখের সোজাসুজি থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

**খাবার**

৭. অধিকাংশ রঙিন সবজি ও ফলমূল চোখের জন্য উপকারি।

৮. গাজর ভালোভাবে ধুয়ে তা দিয়ে জুস বানাতে পারেন।

৯. পুদিনা পাতা ও ধনেপাতার একত্রে জুস বানিয়ে তাতে লেবু ও সামান্য লবণ মিশিয়ে পান করুন।

১০. নিয়মিত দুধ পান করা এবং দই খাওয়া চোখের জন্য ভালো।

১১. টমেটো, আঙুর, বেরি, পেঁপে এবং পেয়ারার মতো বিভিন্ন দেশি ফল চোখের জন্য উপকারি।

**দূষণ এড়িয়ে চলতে**

১২. চোখের অন্যতম শত্রু বিভিন্ন ধরনের দূষণ। তাই বিষাক্ত পদার্থ ও রাসায়নিক থেকে চোখ রক্ষা করুন।

১৩. অপ্রয়োজনীয় ড্রাগ, অ্যালকোহল, ধূমপান ইত্যাদি চোখের ক্ষতি করে।

১৪. ধুলোবালি থেকে চোখ রক্ষা করতে প্রয়োজনে সানগ্লাস ব্যবহার করুন।

১৫. চোখের যত্নে ক্যাফেইনেটেড পানীয় যেমন কফি, সফট ড্রিংক্স ও কৃত্রিম রংযুক্ত পানীয় বর্জন করুন।

কালের কণ্ঠ অনলাইন
৩০ নভেম্বর ২০১৮

## অর্জিত খুশি

হরিপ্রিয়া সরকার
সদস্য ৫০৯/২০০২

নিথর চোখের দৃষ্টি দেখে
বোঝা তো যায় না হায়!
কী যে ভেবে ভেবে জানি না তার
দিনগুলি কেটে যায়।
কাশফুলগুলো রক্তে রঙিন
মনে হয় বুঝি তার।
তাই তো তার চোখ দুখানি
বুজে আসে বারবার।

স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে
কী গভীর বেদনায়।
জলহীন সেই চোখের চাহনি
কী যেন জানতে চায়।
'মনি' বলে ডাকতে সবাই
অনেক আদর করে।
ছোটাছুটি আর দুষ্টুমি করত
সারাটি দিন ভরে।

সঙ্গী ছিল ছোট্ট ভাইটি
দুষ্টুমিতে পাকা।
দিনগুলি আজ হারিয়ে গেছে
মেঘে পড়েছে ঢাকা।
স্বপ্ন আঁকা চোখ নিয়ে মনি
গিয়েছিল স্বামীর ঘরে।
'সোনাবউ' বলে ডাকত তাকে
স্বামীটি আদর করে।

ছোট্ট শিশুর 'মা' ডাক শুনে
খুশিতে ভরেছে মন।
ভেবেছিল সে সবচেয়ে সুখি
পূর্ণ তার জীবন।
হঠাৎ এক মধ্যরাতে
কী যেন কী হলো।
মুহূর্তে সব সাজানো বাগান
হয়ে গেল এলোমেলো।

দেশ মাতাকে ছিনিয়ে নিতে
ঐ কারা ছুটে আসে।
মাকে বাঁচাতে চলে আসে সবে
পালিয়ে যাসনে ত্রাসে।
ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে সবাই
না ভেবে ডান বাম।
সেই যুদ্ধের নাম যে হলো
স্বাধীনতা সংগ্রাম।

মনি হলো ধর্ষিতা নারী
সন্তান হারা মা।
স্বামীটি তার কোথায় আছে
কেউ তা জানে না।
ভাইয়ের রক্তে, বাবার রক্তে
লাল হয়ে গেল সব।
তবুও স্লোগান ধ্বনিত হয়েছে
বাতাসে উঠেছে রব।

কত ত্যাগ, কত কষ্ট শেষে
নয়টি মাস পরে
স্বাধীনতার খুশি ছড়িয়ে পড়ল
বাংলার ঘরে ঘরে।

নবীন মে-আগস্ট ২০০৮ সংখ্যা থেকে নেওয়া

## বাঙালি মোরা

মো. আল রাব্বী হাসান নিরব
সদস্য ১৩০৬/১৭

তোমায় ভেবে ভেবে চলে এসেছি হাজার পথ
এ যেন বাঙালির রক্তে আঁকা লাল আলপথ।
'৪৮ থেকে ৫২' তারপর একাত্তর
এসেছিল হাজারো শত্রুসেনা, সব করেছি দূর।
ভীতু নইকো মোরা, মোরা তো সহনশীল।
তাই বলে শুধুই সহ্য করব? এই যদি ভেবে থাকো,
তবে দেখিয়ে দিয়েছি, ভেঙে সব অন্ধকার দুয়ারের খিল।
অগ্রজ মোরা, মোরা আলোর দিশারি।
যতই পিষে ফেলতে চাও না কেন,
হাজারো বন্ধুর পথ মোরা দিয়েছি এবং দিব পাড়ি।
বাঙালি মোরা, বাংলা মোদের মা
রেখেছি তার মান
সহ্য করেছি, আপোস করিনি
রক্ষা করেছি তার সম্মান।

# শীতে গ্রাম বাংলার প্রকৃতির কাছে

বেড়ানোর সময় পেলে আমরা অনেকেই বেছে নিই পাহাড় বা সমুদ্রকে। কিন্তু শহুরে জীবনে অভ্যস্ত মানুষ প্রকৃতির কাছে খুব একটা যাই না। তাই শীতে প্রকৃতি উপভোগ করতে ঘুরে আসতে পারেন খেজুর আর সরষে ক্ষেতে ভরা বাংলার কিছু গ্রাম থেকে।

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হইতে দুই পা ফেলিয়া, একটি ঘাসের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই কথা যুগে যুগে যথার্থই। কনকনে শীতের সকালে গাছতলায় বসে এক পেয়ালা খেজুর রস শেষ কবে পান করেছেন মনে আছে? অনেকের জীবনে হয়ত সে সুযোগই হয়নি। আবার যাঁদের সে সুযোগ হয়েছে, কর্মব্যস্ততার কারণে হয়ত তা ভুলতেই বসেছেন। এই শীতেই তাই কিছুটা সময় বের করে ফেলুন। ঘর থেকে মাত্র দু'পা দূরে গিয়ে দেখে আসুন বাংলার প্রকৃতিকে।

গ্রাম বাংলায় শীতের সঙ্গে খেজুর রসের সম্পর্ক নিবিড়। যাঁদের বেশি সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ নেই, তাঁরা যেতে পারেন ঢাকার কাছেই মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা গ্রামে। এ গ্রামের মেঠো পথগুলোর দু'পাশ জুড়ে আছে প্রচুর খেজুর গাছ। শীতে এ গ্রামের মানুষের ব্যস্ততা তাই বেড়ে যায়। খেজুর গাছের রস সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন বিকেলে গাছ কাটা আর প্রত্যুষে রস সংগ্রহ করে তা থেকে গুড় তৈরি করা হয়। ডিসেম্বরের শুরু থেকে জানুয়ারির শেষ অবধি বাংলাদেশে খেজুর রস পাওয়া যায়। এ সময়ে জায়গাটির 'ল্যান্ডস্কেপ'-এ বৈচিত্র্য আনে অপূর্ব সরিষা খেত। এ সময় এখানে দেখা যায় ভ্রাম্যমাণ মধুচাষিদেরও। ঝিটকার খেজুর গুড়েরও সুনাম আছে। তাই এর স্বাদ নিতেও ভুলবেন না। তাছাড়া ঝিটকা গ্রামের মিনহাজ উদ্দিন হাজারীর উদ্ভাবিত সাদা রঙের খেজুর গুড়ের সুনাম কিন্তু দেশজোড়া। যুগ যুগ ধরে হাজারী পরিবারসহ গ্রামের বেশ কয়েকজন কারিগর এখনও ধরে রেখেছেন এই হাজারী গুড়ের ঐতিহ্য।

এই শীতে যাঁদের দু-তিন দিনের সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ আছে, তাঁরা কিন্তু যশোর যেতে ভুলবেন না। ইটের ভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খেজুর গাছ হারিয়ে গেলেও যশোর অঞ্চল ব্যতিক্রম। যশোরের বিভিন্ন এলাকায় এখনো প্রচুর খেজুর গাছ আছে। এই যেমন যশোর শহরের কাছেই একটি এলাকা আছে, যার নাম 'খাজুরা'। জায়গাটিতে গেলে এর নামের সার্থকতা খুঁজে পাবেন। মাইলের পর মাইল শীতের সবজি খেত, মাঝে সারি সারি খেজুর গাছ। সূর্য ওঠার আগে এখানে গাছিরা ব্যস্ত থাকেন রস নামাতে। সেই রস নিয়েই পরে গৃহবধূরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন গুড় তৈরিতে।

যশোরের আরেকটি এলাকা অভয়নগর। শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরের এ অঞ্চলও খেজুর রসের জন্য বিখ্যাত। অভয়নগর বাস স্টেশন থেকে পূর্ব দিকে বুড়ি ভৈরব নদী পার হয়ে ওপারে গেলে মাইলের পর মাইল খেজুর গাছ। শীতকালে এখানে কৃষি খেতগুলো ভরপুর থাকে সরিষায়। এখানকার মেঠোপথে চলতে চলতে নাকে তাই ছোঁয়া দিয়ে যায় সরিষা ফুলের মাতাল করা ঘ্রাণ। চাইলে এখানকার মেঠোপথে ঘুরে বেড়াতে পারবেন গরুর গাড়িতে করেও।

এছাড়া শীতে বাংলাদেশের আরো অনেক এলাকায় প্রকৃতিতে বড় পরিবর্তন আনে সরিষা খেত। সবুজমাঠ যেন ঢেকে যায় হলুদ গালিচায়। যে কোনো দিন কিছুটা সময় করে তাই ঘুরে আসতে পারেন কাছে-দূরের কোনো এক সরিষা খেতের হলুদ প্রান্তর থেকে।

ঢাকার খুব কাছাকাছি সরিষা ফুলের জন্য সুন্দর আর একটি জায়গা মানিকগঞ্জের মানিকনগর। সাভারের হেমায়েতপুর থেকে সিঙ্গাইরের সড়ক ধরে কিছুদূর গেলে ধলেশ্বরী সেতু। ওপারে বিন্নাডিঙ্গি বাজার থেকে বাঁয়ের সড়কে কয়েক কিলোমিটার চললেই মানিকনগর। শীতে প্রকৃতি যেখানে ছবির মতো।

ঢাকার কাছাকাছি সরিষা ফুলের আরেক জগত মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর, সিরাজদিখান আর টঙ্গিবাড়ী। এখানকার আড়িয়াল বিল কিংবা সোনারং এলাকাতেও আছে প্রচুর সরিষা খেত। ঢাকা থেকে খুব সকালে শুরু করলে সারাদিন বেড়িয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা সম্ভব এ সব জায়গা থেকে।

সরিষা খেতে বেড়ানোর আরেক অপূর্ব জায়গা চলনবিল। সিরাজগঞ্জ, নাটোর এবং পাবনা জেলা জুড়ে বিশাল এই বিল শীত মৌসুমে হলুদ এক স্বর্গের রূপ নেয়। শীতে শুকিয়ে যাওয়া চলনবিলের বেশিরভাগ জমিতেই এ সময়ে চাষ হয় সরিষার। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু পেরিয়ে হাটিকুমরুল-বনপাড়া সড়কে কিছুক্ষণ চললেই পাওয়া যাবে চলনবিলের বিস্তীর্ণ সরিষা খেতের। চলনবিলের সালঙ্গা, তাড়াশ, হরিণচড়া, দবিলা, কাছকাটা প্রভৃতি জায়গায় সরিষা খেতের প্রাধান্য বেশি।

তাই আর দেরি কেন? এখনই বেরিয়ে পড়ুন গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথে...।

বিসিএস প্রস্তুতি

# বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গণিতের মতো নম্বর

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার তিন অস্ত্র–গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি। গণিতের মতো বিজ্ঞানেও ভালো নম্বর তুলে অন্য পরীক্ষার্থীদের চেয়ে ক্যাডার হওয়ার দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে থাকা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মুখস্থের বিষয় নয়, বুঝে পড়ার বিষয়। প্রতিদিন বুঝে বুঝে পড়লে এ বিষয়ে ভালো করা সম্ভব। লিখেছেন ৩৬তম বিসিএসে অ্যাডমিন ক্যাডারে প্রথম ইসমাইল হোসেন।

## নম্বর বণ্টন

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে বরাদ্দ ১০০ নম্বর। সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তিনটি অংশে বিভক্ত। সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস টেকনোলজি। তিন ঘণ্টার এই পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য ৬০ নম্বর, কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তির জন্য ২৫ নম্বর এবং ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকসের জন্য ১৫ নম্বর বরাদ্দ।

৬০ নম্বরের সাধারণ বিজ্ঞান অংশে ৭.৫ নম্বরের মোট ৯টি প্রশ্ন থাকে। যেকোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর করতে হয়। ২৫ নম্বরের কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি অংশে ২.৫ নম্বরের মোট ১২টি প্রশ্ন থাকে। উত্তর করতে হয় ১০টির। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস অংশে ২.৫ নম্বরের আটটি প্রশ্ন থাকে। উত্তর করতে হবে ছয়টির।

## সাধারণ বিজ্ঞান

### দেখে নিন সিলেবাস

৬০ নম্বরের সাধারণ বিজ্ঞান অংশে মোট টপিক রয়েছে ১১টি। সাধারণত প্রতিটি টপিক থেকেই প্রশ্ন করা হয়। আলো, শব্দ, চুম্বকত্ব, এসিড, ক্ষার ও লবণ, পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ (গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, কয়লা), পলিমার, বায়ুমণ্ডল, খাদ্য ও পুষ্টি, জৈবপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি টপিকের ওপর প্রশ্ন হয়।

### প্রস্তুতি ও লেখার কৌশল

প্রথমে বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সাধারণ বিজ্ঞান অংশের প্রশ্নগুলো দেখে নিতে হবে। বিশেষ করে ৩৫তম থেকে ৩৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। এতে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা হবে। এই অংশে সাধারণত সৃজনশীল প্রশ্ন হয়। সাধারণ বিজ্ঞান অংশের বেশির

ভাগ টপিক নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের সঙ্গে মিলে যায়। এর সঙ্গে অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান, উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বই থেকে কিছু টপিক পড়তে হবে। অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের দশম, ১১তম, ১৩তম, ১৪তম অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ। নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, ১১তম, ১৩তম ও ১৪তম অধ্যায়, নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম, অষ্টম, নবম, ১৪তম অধ্যায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বইয়ের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, দশম, ১২তম অধ্যায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

- প্রতিটি টপিক সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকলে প্রশ্ন যেভাবেই আসুক না কেন, উত্তর করা যায়। তাই মুখস্থ না করে বুঝে বুঝে পড়তে হবে।
- সাধারণত প্রশ্নগুলো যেহেতু সৃজনশীল হয়, সৃজনশীল আকারে প্রস্তুতি নিলে উত্তর করা সহজ হবে।
- অনেক প্রশ্নের উত্তর করতে হয়, তাই প্রতিটি প্রশ্নের মূল কথা লিখতে হবে। মূল কথা লিখতে পারলেই নম্বর, অযথা বেশি লেখার প্রয়োজন নেই।
- উপস্থাপনায় বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করলে নম্বর বেড়ে যাবে।
- প্রাসঙ্গিক চিত্র দিলে উত্তরের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। কিন্তু যেসব প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক চিত্র দেওয়ার সুযোগ নেই, সেসব প্রশ্নের উত্তরে নম্বর বেশি পাওয়ার আশায় জোর করে চিত্র দিলে উত্তরের গ্রহণযোগ্যতা কমার পাশাপাশি নম্বর কম আসবে। তাই জোর করে চিত্র দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে পেনসিল ব্যবহার করুন।
- বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে চার্ট দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডিএনএ টেস্টের পদ্ধতি লেখার ক্ষেত্রে একটি চার্ট দিতে পারেন।
- বিজ্ঞানের সূত্র ও রসায়নের বিক্রিয়া লেখার ক্ষেত্রে নীল কালির বলপেন ব্যবহার করুন।
- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে ক্রমিক ও উপক্রমিক নম্বর ঠিক রাখুন। উদাহরণস্বরূপ আপনি সাধারণ বিজ্ঞান প্রথমে উত্তর করবেন এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর প্রথমে লিখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ৪ নম্বর প্রশ্নের ক, খ এবং গ-এর ক্রমিক ঠিক রাখুন। কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস টেকনোলজি অংশ লেখার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

## কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি

### দেখে নিন সিলেবাস

সাধারণত কম্পিউটারের ইতিহাস, প্রজন্ম, সিপিইউ মাইক্রোপ্রসেসর, মেমোরি, ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস, বায়োস, টেক্স এডিটর, কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার, সফটওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ভাইরাস, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ, ডাটা বেইস, নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্ক ডিভাইস, আইপি প্রটোকল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়াই-ফাই, ওয়াইম্যাক্স, স্মার্ট ফোন, ই-কমার্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন আসে।

### প্রস্তুতি ও লেখার কৌশল

প্রথমেই বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন আয়ত্ত করতে হবে। বিগত সালের প্রশ্ন থেকে কিছু প্রশ্ন রিপিট হয়। এই অংশের প্রস্তুতির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বই সহায়ক হবে। বইটির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ অধ্যায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া যেকোনো ভালো মানের সহায়ক বই থেকে প্রস্তুতি নিতে পারেন। প্রতিদিন পত্রিকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অংশ দেখলেও কাজে দেবে। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে মূল কথা লিখতে হবে, প্রয়োজনে চিত্র ও চার্ট দিতে হবে।

## ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস টেকনোলজি

### দেখে নিন সিলেবাস

এই অংশে সাধারণত বিদ্যুৎ, বিভব শক্তি, ওহমের সূত্র, তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ, সার্কিট ব্রেকার, কার্শপের সূত্র, রোধ, এসি ও ডিসি ভোল্টেজ, মোটর, ট্রান্সফরমার, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, আইপিএস, ইউপিএস, বিবর্ধক, সেমিকন্ডাক্টর, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন আসে।

### প্রস্তুতি ও লেখার কৌশল

বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে প্রশ্ন রিপিট হয়। তাই বিগত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো প্রথমেই পড়তে হবে। এই অংশের জন্য অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের নবম অধ্যায়, নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের দশম, ১১তম, ১২তম, ১৩তম অধ্যায়, উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বইয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, ১৪তম অধ্যায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া সহায়ক বই থেকে প্রস্তুতি নিতে পারেন।

সূত্রগুলো একটি খাতায় লিখে রাখলে শেষ দিকে রিভাইস করতে সুবিধা হবে।

কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস টেকনোলজিতে সঠিক উত্তর লিখতে পারলে গণিতের মতো পুরো নম্বর পাওয়া যায়।

মূল কথায় উত্তর করতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক চিত্র থাকলে দিতে হবে।

বিজ্ঞান পরীক্ষার বড় চ্যালেঞ্জ হলো, সব প্রশ্নের উত্তর লিখে আসা। কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসবেন না। বিজ্ঞানে সময় ব্যবস্থাপনা না করতে পারলে এর প্রভাব গিয়ে পড়ে প্রযুক্তি অংশের ওপর। তাই প্রথমে প্রযুক্তি অংশের উত্তর করা বুদ্ধিমানের কাজ।

# ফাউন্ডেশন সংবাদ

## হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২০ অক্টোবর ২০১৮, শনিবার অনুষ্ঠিত হলো ফাউন্ডেশনের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ঢাকাস্থ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অফিস ফ্ল্যাট: ৯/সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, ২৩/৬ বীর উত্তম এ.এন.এম. নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী-এ অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) প্রফেসর ড. এ আর খান। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. হামিদা আখতার বেগম, মিসেস হোসনে আরা হক, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, মিসেস খুশী কবির, জনাব খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ, মিসেস সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, অধ্যাপক ড. রওশন আরা ফিরোজ, ডা. এ কে আজাদ খান, মিসেস ফিরোজা বেগম, ড. আয়েশা বানু এবং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক তাসনিম হাসান হাই।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দুই বছরের জন্য মেজর জেনারেল (অব.) প্রফেসর ড. এ আর খান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে পুনঃ নির্বাচিত হন। সভায় ফাউন্ডেশনের ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদিত হয়। সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণ ফাউন্ডেশনের ২০১৭-১৮ সালের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং আগামী দিনের কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

## অভিনন্দন!!

অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশে জাপানি সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি জাপান সরকার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য, বরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' এ ভূষিত করেছে।

বরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সাধারণ পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য। তাই তাঁর এই বিশেষ সম্মাননা অর্জনে আমরা ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত এবং একইসাথে গর্ব বোধ করছি। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেশবরেণ্য এই শিক্ষাবিদকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন!! আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

# প্রকল্প সংবাদ

## অভিনন্দন!!

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. আবদুল হামিদ আগামী ৪ বছরের জন্য ড. হামিদা আখতার বেগম-কে 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি)'-এর সহ-উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেছেন। ড. হামিদা আখতার বেগম কানাডার মনিটোবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসনসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

ড. হামিদা আখতার বেগম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অনারারি ট্রেজারার এবং গভর্নিং বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য বিধায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় আমরা উচ্ছ্বসিত এবং একইসাথে গর্ব বোধ করছি। ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে বরেণ্য এই শিক্ষাবিদকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন!! আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

প্রকল্পের ১৯৯৭ ব্যাচের সদস্য মো. মহিউদ্দিন (সদস্য নং ২৬২/৯৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে ফার্মেসী অনুষদের অন্তর্গত ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম : 'The potentiation and broadening the effect of low molecular hypoglycemic drugs through interaction with some CNS stimulant molecules' তাঁর এই সাফল্য অর্জনে আমরা গর্বিত। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন!!

উল্লেখ্য, মো. মহিউদ্দিন ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে এমএসসিতে ৫ম স্থানসহ ১ম শ্রেণি এবং ২০০৩ সালে বিএসসিতে ২য় শ্রেণিতে ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন। মো. মহিউদ্দিন ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা থেকে ১ম বিভাগে এইচএসসি এবং ১৯৯৭ সালের ছুল্লাবাদ ইউ এ খান উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১ম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়। সফলতার সাথে শিক্ষাজীবন শেষ করে মো. মহিউদ্দিন বর্তমানে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডে ম্যানেজার (কোয়ালিটি এন্ড রেগুলারিটি অপারেশনস) হিসাবে কর্মরত আছেন। আমরা তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

তাবাসসুম সুলতানা (সদস্য নং ৮৫০/২০১০) সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ থেকে সিজিপিএ ৩.৭৯ সহ বিএসসি (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তাবাসসুম সুলতানা শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে ২০১২ সালে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এইচএসসি এবং এর আগে মডার্ণ একাডেমী, ঢাকা থেকে ২০১০ সালে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

# প্রকল্প সংবাদ

## মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৮ ব্যাচের চূড়ান্ত বাছাই সম্পন্ন

সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদানের জন্য মেধালালন প্রকল্প'র নতুন ব্যাচের সদস্যদের চূড়ান্ত বাছাইপর্ব সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮ ব্যাচের নব-নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

| ক্রমিক নং | ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা | ক্রমিক নং | ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা |
|---|---|---|---|
| ০১. | মিতা মন্ডল, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ি। | ০১. | মো. তকী শাহরিয়ার, মিঠাপুকুর, রংপুর। |
| ০২. | কণা মন্ডল, চালনাবাজার, দাকোপ, খুলনা। | ০২. | মো. আহসান হাবীব, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট। |
| ০৩. | মোছা. ফারজানা আক্তার, জামালপুর সদর। | ০৩. | মো. মাহামুদুল হাসান, কাউনিয়া, রংপুর। |
| ০৪. | আনজিদা হোসেন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ০৪. | মো. নুর নবী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা। |
| ০৫. | সায়মা জাহান দৃষ্টি, জামালপুর সদর। | ০৫. | পারভেজ হক, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ। |
| ০৬. | মোসা. আঞ্জুরা খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ০৬. | মো. ওমর ফারুক, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট। |
| ০৭. | মোছা. রাদিয়া খাতুন, জামালপুর সদর। | ০৭. | স্নেহ সাহা মুগ্ধ, চালনা বাজার, দাকোপ, খুলনা। |
| ০৮. | সুরাইয়া খানম, ঝিকরগাছা, যশোর। | ০৮. | মো. সিদরাতুল ইসলাম, মিঠাপুকুর, রংপুর। |
| ০৯. | মোছা. মনিরা সুলতানা মিষ্টি, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট। | ০৯. | শ্রীদাম, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ১০. | মোছা. তাহমিদা নাজিয়া, মিঠাপুকুর, রংপুর। | ১০. | মোস্তাকিম ইসলাম, মিঠাপুকুর, রংপুর। |
| ১১. | মোছা. জাকিয়া খাতুন, মিঠাপুকুর, রংপুর। | ১১. | আল সাবরিয়া হোসেন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। |
| ১২. | জান্নাতুল ফেরদৌসি রুম্পা, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট। | ১২. | মো. মাহমুদ হাসান ফুয়াদ, মিঠাপুকুর, রংপুর। |
| ১৩. | মোসা. মনিসা খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ১৩. | মো. গোলাম আজম, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ১৪. | মোসা. জান্নাতুন ফেরদৌস, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ১৪. | মো. সাগর আলী, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ১৫. | নুর-এ-তাজিন, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট। | ১৫. | মোহা: শফিউল্লাহ, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ১৬. | মোসা. রেশমী খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ১৬. | মো. জোবায়ের হোসেন, মিঠাপুকুর, রংপুর। |
| ১৭. | তোহফায়ে জান্নাত স্বর্ণা, মিঠাপুকুর, রংপুর। | ১৭. | মো. আরিফুল ইসলাম, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ১৮. | তাইয়েবা আক্তার, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর। | ১৮. | চয়ন চন্দ্র সূত্রধর, জামালপুরসদর |
| ১৯. | যাবিন তাসনিম লুম্মাত, আটোয়ারী, পঞ্চগড়। | ১৯. | মো. শাহাদাত হোসেন, জামালপুর সদর। |
| ২০. | মোসা. সেহেনাজ খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ২০. | মো. নাজমুল হক, জামালপুর সদর। |
| ২১. | মোসা: শিরিন আক্তার, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ২১. | মোহা: গালিব হাসান, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ২২. | মোছা. সেলিনা আক্তার, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট। | ২২. | সান্তানু চন্দ্র শিয়ালী, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর। |
| ২৩. | তাহেরা জুবায়ের মীম, চালনা বাজার, দাকোপ, খুলনা। | ২৩. | মো. আজিজুল হক, জামালপুর সদর। |
| ২৪. | আফরোজা খানম লিলি, দাকোপ, খুলনা। | ২৪. | মো. জসীমউদ্দীন জীবন, জামালপুর সদর। |
| ২৫. | যুথী খাতুন, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। | ২৫. | মো. আজাদুল সরকার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। |
| ২৬. | মাইসা আঞ্জু, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ২৬. | শ্রী স্বপন চন্দ্র, মিঠাপুকুর, রংপুর। |
| ২৭. | মোছা. তামান্না আক্তার তানিয়া, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। | ২৭. | মো. মিজানুর রহমান, মিঠাপুকুর, রংপুর। |
| ২৮. | মোছা. মোখলেছা আক্তার, পিরগাছা, রংপুর। | ২৮. | মোহা: কাউসার আলি, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ২৯. | মোসা. শাপলা খাতুন, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। | ২৯. | মো. মাসুদ পারভেজ হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট। |
| ৩০. | মোছা. কুহিলী আক্তার, মিঠাপুকুর, রংপুর। | ৩০. | মোহা. নাহিদ আলম, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| | | ৩১. | মো. আহসানুল ইসলাম, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। |

# মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৪ (ছাত্র)

| ক্রমিক | ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা | বর্তমানে কোথায় পড়ছে |
|---|---|---|
| ১. | মো. শাহজালাল ১১১৭/২০১৪<br>রানীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর। | কম্পিউটার সাইন্স, ১ম বর্ষ<br>শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। |
| ২. | মো. আনিছুর রহমান ১১১৯/২০১৪<br>চান্দিনা, দোল্লাই নবাবপুর, কুমিল্লা। | রসায়ন, ২য় বর্ষ<br>জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। |
| ৩. | মো. এহসানুল হক ১১২০/২০১৪<br>সিংড়া, নাটোর। | ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জি., ৫ম পর্ব<br>ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা। |
| ৪. | আবু তাহের মো. রিফাত ১১২৩/২০১৪<br>রানীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর। | ইংরেজি, ১ম বর্ষ<br>রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী। |
| ৫. | সজীবুর রহমান ১১২৪/২০১৪<br>কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। | পদার্থ বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ<br>ঢাকা কলেজ। |
| ৬. | মো. একরামুল হক ১১২৫/২০১৪<br>সিংড়া, নাটোর। | বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ১ম বর্ষ<br>মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। |
| ৭. | মো. রাকিবুল বিশ্বাস ১১২৬/২০১৪<br>বটবুনিয়া, দাকোপ, খুলনা। | তড়িৎ ও কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগ, ২য় বর্ষ<br>রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)। |
| ৮. | শেখ তারেকুজ্জামান ১১২৭/২০১৪<br>চুলকাটি, রাখালগাছি, বাগেরহাট। | মার্কেটিং, ২য় বর্ষ<br>ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। |
| ৯. | মো. আমিনুল ইসলাম ১১২৯/২০১৪<br>আঘোর মালঞ্চ, কাহালু, বগুড়া। | বায়োকেমিস্ট্রি, ২য় বর্ষ<br>রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। |
| ১০. | মো. জিয়াউর রহমান ১১৩০/২০১৪<br>কুমড়ীরহাট, আদিতমারী, লালমনিরহাট। | গণিত, ৩য় বর্ষ<br>খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। |
| ১১. | মো. মোরসালিন মিয়া ১১৩১/২০১৪<br>রানীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর। | পরিসংখ্যান বিভাগ, লেভেল-১<br>হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর। |
| ১২. | মো. জান্নাতুল নাঈম মিথুন ১১৩২/২০১৪<br>চিলমারী, কুড়িগ্রাম। | বিএসসি ইন নার্সিং, ১ম বর্ষ<br>রংপুর নার্সিং কলেজ, রংপুর। |
| ১৩. | মীর মো. রহমতুল্লাহ ১১৩৩/২০১৪<br>ধাড়কী, জয়পুরহাট। | মৎস্যবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ<br>হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর। |
| ১৪. | মো. হুমাউন কবির ১১৩৪/২০১৪<br>খোড়াগাছ, মিঠাপুকুর, রংপুর। | ডিভিএম, লেভেল-১<br>বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। |
| ১৫. | মো. ফজর মন্ডল ১১৩৫/২০১৪<br>ভোটমারী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট। | প্রাণিবিদ্যা, ১ম বর্ষ<br>বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। |
| ১৬. | মো. শাহীন মিয়া ১১৩৮/২০১৪<br>চিলমারী, কুড়িগ্রাম। | ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন, ৩য় বর্ষ<br>জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। |
| ১৭. | মো. রাশেদুল ইসলাম ১১৪২/২০১৪<br>লালপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর। | পশুপালন, ১ম বর্ষ<br>বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। |
| ১৮. | মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ১১৪৩/২০১৪<br>রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া, রাজশাহী। | প্রাণীবিদ্যা, ১ম বর্ষ<br>জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা। |

# মাথায় কত প্রশ্ন আসে

## মোনালিসার হাসির রহস্য কি?

মোনালিসা চিত্রকর্মটি যত পুরনো এটা নিয়ে বিতর্কও তত পুরনো। সাধারণ মানুষ তো বটেই বড় বড় শিল্প বোদ্ধারাও মাথার চুল ছিঁড়েছেন মোনালিসার মুখের অভিব্যক্তির রহস্য উদঘাটনে। কেউ বলেন মোনালিসাকে হাসতে দেখা যাচ্ছে, তো কেউ এর বিরোধিতা করেন। মোনালিসা কি তবে এতটাই রহস্যময়?

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলছে, 'হয়ত না'।

মোনালিসার রহস্য ভেদে বিশেষ এক ব্যবস্থা নেন স্নায়ু বিজ্ঞানীরা। আর এতে যা ফলাফল এসেছে তা দেখে তারা অবাক না হয়ে পারেননি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় শতভাগই বলেছেন মোনালিসার মুখের অভিব্যক্তি হাসির।

ইতালীয় ভাষায় লা জোকোন্দা বা ইংরেজিতে মোনালিসা যে নামেই ডাকা হোক না কেন ছবিটি এক নজর দেখে বেশিরভাগ মানুষই বলেন ছবির ওই নারীর অভিব্যক্তি হাসির। তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অনেকেই আবার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে বলেন তার চেহারায় অবজ্ঞা বা দুঃখ ভাব রয়েছে।

কয়েকশ বছর পুরনো এই ধাঁধাটাকে মাটিচাপা দিতে, চেহারার অভিব্যক্তি বুঝতে আমাদের মস্তিষ্ক যে বিষয়গুলো অবচেতনভাবেই কাজে লাগায় সেগুলোর সূত্র ধরে এগিয়েছেন গবেষকরা।

তারা প্রথমে যে কাজটি করেন তা হলো ষোড়শ শতাব্দীর ছবিটির সাদাকালো একটি কপি সূক্ষ্মভাবে সম্পাদনা (এডিট) করে মুখের ভাঁজগুলো একটু এদিক সেদিক করে এমন চারটি ছবি তৈরি করেন যাতে তাকে মূল ছবির চেয়ে বেশি হাসিখুশি লাগে। সেই সাথে আরও চারটি ছবি তৈরি করা হয় যেখানে তাকে তুলনামূলকভাবে দুঃখী বলে মনে হয়।

এখন মূল ছবির একটি কপি ও সম্পাদনা করা আটটি ছবি নিয়ে একটি ব্লক সাজানো হয়। গবেষণায় অংশ নেওয়া ১২ জনকে এই ছবির ব্লকটি ৩০ বার দেখানো হয়। তবে প্রত্যেক বার দেখানোর আগে ছবিগুলোর বিন্যাস বদলে দেওয়া হয়। প্রত্যেকবার ছবি দেখানোর সময় তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় কোন ছবিটিতে মোনালিসাকে হাসতে আর কোন ছবিতে মুখ ভার করে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

'এই প্রশ্নের পর আমরা ভেবেছিলাম ৯টি ছবির মধ্যে আসল ছবিটি কপিটি দেখে তারা হয়ত বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন। তবে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম দা ভিঞ্চির আঁকা ছবিটি দেখে প্রায় ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রে তারা বলেছেন ছবির ওই নারী হাসছেন।'

গবেষণার পরের দফায় আসল মোনালিসার সঙ্গে আটটি 'দুঃখী মোনালিসা' দেখানো হয়। এবারের এডিট করা ছবিগুলোতে তাকে আগের বারের চেয়েও বেশি দুঃখী করে দেখানো হয়। কিন্তু এবারও আসল ছবির নারীকে হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছে বলে জানিয়ে দেন স্বেচ্ছাসেবকরা।

বিজ্ঞানীরা এ থেকে সিদ্ধান্তে আসেন, 'মানুষের মস্তিষ্কে সুখ বা দুঃখ মাপার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকে না। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি (কনটেক্সট) বড় ভূমিকা পালন করে।'

গবেষক দলের প্রধান বলেন, 'আমাদের মস্তিষ্ক খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। আমরা পুরো বিষয়টি এক নজর দেখি আর পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেই।' মানসিক রোগ বুঝতে এই গবেষণা কাজে দিতে পারে বলেও মনে করছেন তিনি।

## প্রসেসর এর জেনারেশন কি, core i3, i5, i7 processor কোনটি নিবেন?

যারা এখানে আগে কম্পিউটারের বিবর্তন ধারা টপিক পড়েছেন তারা অনেকেই কনফিউশনে পড়ে গেছেন হয়ত, কারণ হাতের সামনের ল্যাপটপে সুন্দর করে লেখা 6th জেনারেশন আর সেখানে কিনা ভদ্রলোক বলে দিয়েছে কম্পিউটারকে ৫টি জেনারেশনে ভাগ করা হয়েছে। দুই কূল রক্ষা করতে বলে ফেলি আসলে আপনিও ঠিক আমিও ঠিক। আসলে সেটি হচ্ছে প্রসেসর এর জেনারেশন। খুব বেশিদিন হয়নি মাত্র 7th Gen রিলিজ হয়েছে।

প্রসেসর হচ্ছে কম্পিউটার এর প্রাণ, এর মূল চালিকাশক্তি। প্রসেসর মূলত দুইটি কোম্পানি তৈরি করে। ইন্টেল ও এএমডি। আমাদের দেশে মূলত ইন্টেল সবচে বেশি ব্যবহার হয়। তবে ইউরোপে এএমডির বাজার বেশি। এই 'জেনারেশন' শব্দটা শুধু ইন্টেল কোম্পানি তার তৈরি প্রসেসরগুলোর বিক্রির কাজে ব্যবহার করে। এটা কোনো আন্তর্জাতিক শব্দ না, এর কোনো মানও নেই। পুরোপুরি ইন্টেলের ব্যাবসা বাড়ানোর একটা পদ্ধতি। জেনারেশন হলো, ইনটেল প্রতি বছর যে প্রসেসর তৈরি করে তার উৎপাদন টেকনিক কতটা উন্নত এবং কতটা ছোট। ইনটেল প্রত্যেক বছরে অর্থাৎ প্রসেসরের প্রতিটি নতুন জেনারেশনে এই ট্র্যান্সিস্টরগুলো কত বেশি ক্ষুদ্র করে বানিয়েছে তা প্রকাশ করে। কম্পিউটার প্রসেসরের ট্র্যান্সিস্টরগুলো যত বেশি ক্ষুদ্র হবে ততো বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন হবে, ততো বেশি দক্ষ হবে এবং কম পাওয়ার ব্যবহার করবে।

### Core i3, i5, i7?

ইন্টেলের প্রচলিত সেলেরন, পেন্টিয়াম প্রসেসরগুলোর ব্যবহার দিন দিন উঠে যাচ্ছে, তার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে ইন্টেলের কোর প্রসেসর। বর্তমানে ইন্টেলের core i3, core i5, core i7 এই ৩টি

প্রসেসর সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এগুলো থেকেই মূলত জেনারেশন শব্দটি ইন্টেল ব্যাবহার করছে। ক্লক স্পিড, ক্যাশ মেমোরি, পাওয়ার ইউজ এই সব সুবিধা দিয়ে জেনারেশন পরিবর্তন হচ্ছে।

### জেনারেশন চিনার উপায়

মনে করুন একটি প্রসেসরের মডেল ইনটেল কোর i7 4770 এবং আরেকটি প্রসেসরের মডেল ইনটেল কোর i7 5770। এখানে প্রথম প্রসেসরটি ৪র্থ জেনারেশন এবং দ্বিতীয় প্রসেসরটি ৫ম জেনারেশন। লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে এর জেনারেশন সংখ্যা এর মডেল সংখ্যার প্রথম সংখ্যা। এভাবেই আপনি খুব সহজেই কম্পিউটার প্রসেসরের জেনারেশন চিনতে পারবেন।

## স্টপ জেনোসাইড কি?

স্টপ জেনোসাইড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। ইংরেজি 'স্টপ জেনোসাইড' শব্দগুচ্ছের অর্থ 'বন্ধ কর গণহত্যা'। শহিদ বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২০ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা, হানাদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, ভারতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের দিনকাল প্রভৃতি এই তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছিল।

জহির রায়হান একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসের দিকে এই তথ্যচিত্র তৈরির পরিকল্পনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন চলমান গণহত্যা ও মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরি করার জন্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সহকারী আলমগীর কবিরকে সাথে নিয়ে তিনি স্টপ জেনোসাইডের কাজ শুরু করেন। মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও চলচ্চিত্র বিভাগ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে সম্মত হয়। কিন্তু পরে এই ছবিটি নিয়ে প্রবাসী সরকারের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়; কারণ ছবিটির কোথাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল না। তথ্যচিত্রে জহির রায়হান চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যুদ্ধের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা, শরণার্থীদের দুরবস্থা আর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকটা বেশি করে তুলে ধরতে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন সারাবিশ্বই মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বদানের বিষয়ে ওয়াকিবহাল, তাই সেটা আর নতুন করে কিছু বলার নেই। পরে প্রয়াত তাজউদ্দীন আহমেদসহ অন্যরা পরিস্থিতি সামাল দেন। স্টপ জেনোসাইডের প্রথম প্রদর্শনী হয় এক অজ্ঞাত স্থানে, যেখানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরি করার ক্ষেত্রে 'স্টপ জেনোসাইড' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে এখন পর্যন্ত নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে শিল্পগত ও গুণগত সাফল্যের দিক থেকে এই চলচ্চিত্রটিকে শীর্ষে স্থান দেয়া হয়ে থাকে।

## পিক্সেল, মেগাপিক্সেল কি?

পিক্সেল (Pixel) বলতে কোন গ্রাফিক ছবির ক্ষুদ্রতম অংশ বা বিন্দুকে বোঝায়। পিক্সেলের হিসাব থেকে ছবি বিষয়ক যাবতীয় কাজ করা হয়। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ডিজিটাল ক্যামেরার কারণে এই পিক্সেল শব্দটি খুব বেশি উচ্চারণ হচ্ছে। ১.৩ মেগা পিক্সেল মানে ১৩০০০০০ পিক্সেল এর সমন্বয়ে তৈরি হওয়া ছবি। যেহেতু ডিজিটালি ছবির মাপ থাকে ৪:৩ সুতরাং ১.৩ মেগা পিক্সেলের ছবিতে ১২৮০x৯৮০ এই রেশিওতে পিক্সেল থাকবে।

এটি ছবির ক্ষুদ্রতম একক যার অভ্যন্তরে আর কোন ভগ্নাংশ নেই; অর্থাৎ পিক্সেল ছবির অতি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যেক পিক্সেলের নিজস্ব অবস্থান বা খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা রয়েছে বলা যায়। কারণ পিক্সেলের অবস্থান নির্দিষ্ট স্থানাংকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ পিক্সেল সাধারণত দ্বি-মাত্রিক তলে সাজানো থাকে এবং ডট বা চারকোণা আকৃতির হয় যার প্রতিটি অবস্থানের আলাদা স্থানাংক (co-ordinate) থাকে। প্রত্যেক পিক্সেল মূল ছবির একটি নমুনা; পিক্সেল যত ছোট হয় তা তত বেশি নির্ভুলভাবে একটি ছবির প্রতিনিধিত্ব করে।

পিক্সলের প্রাবল্য (intensity) একটি চলরাশি। রঙিন ছবির প্রতিটি পিক্সেলে রং সম্পর্কিত তিন বা চারটি চলকের মান থাকতে পারে। লাল-সবুজ-নীল কিংবা সায়ান-ম্যাজেন্টা-হলুদ-কালো।

## মেগা পিক্সেল

মেগা পিক্সেল ডিজিটাল ছবির গুণাগুণ বর্ণনার একক। মেগা=১০০০,০০০ আর পিক্সেল হল রেজুলেশনের একক। ৮০০x৬০০ (৪৮০০০০=০.৪৮ মে.পি.) পিক্সেল মানে ঐ ছবিতে প্রতি ইঞ্চিতে অনুভূমিকভাবে ৮০০ এবং লম্বাভাবে ৬০০ পিক্সেল আছে। মেগাপিক্সেল শব্দটি কোন ছবিতে পিক্সেলের সংখ্যার জন্যই কেবল ব্যবহার করা হয় না। এটি ডিজিটাল ক্যামেরার ছবির ক্ষুদ্রতম উপাদান (sensor element) এর সংখ্যা ব্যক্ত করতে অথবা ডিজিটাল ছবির প্রদর্শনকারী একক (display elements of digital displays) প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০৪৮×১৫৩৬ ক্ষুদ্রতম উপাদানের সমন্বয়ে ছবি তৈরি করতে পারে এমন ক্যামেরাকে সাধারণভাবে বলা হয় '৩.১ মেগাপিক্সেল' (২০৪৮×১৫৩৬=৩,১৪৫,৭২৮)। মেগাপিক্সেল সাধারণভাবে ক্যামেরার যোগ্যতা পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় ক্যামেরার গুনমান নির্ধারণ করে। পিক্সেল হিসাব করা হয় ২টি রেজুলেশনের গুণফলকে ১০৬ দিয়ে ভাগ করে দশমিকের পরের সংখ্যা পর্যন্ত নেয়া হয়। অধিকাংশ ডিজিটাল ক্যামেরার সংবেদী পর্দাতে সারি সারি রঙের প্যাটার্ন করা থাকে যেখানে লাল, সবুজ ও নীল বর্ণ, বেয়ার ফিলটার ব্যবস্থার (Bayer filter) মাধ্যমে মোজাইক করে সুসজ্জায়ন করা হয়। ফলে কোন নির্দিষ্ট পিক্সেল একটি একক প্রাথমিক রঙের তীব্রতাই কেবল ধারণ করতে পারে।

ছবি : রুমা বাজার বাংলাদেশ | মাধ্যম : জলরং | শিল্পী : সাদেক আহমেদ

ছবি : প্রকৃতির সান্নিধ্যে | মাধ্যম : জলরং | শিল্পী : ওয়ারিওর রহমান সামী

# নবীন

ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদক তাসনিম হাসান হাই কর্তৃক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড
প্লট নং-২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ এর পক্ষে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : যাযাবর মিঠু। মুদ্রণ : পালক ০১৭১১৮৩৪০১৭। গ্রাফিক ডিজাইন : মমিন হোসেন